POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ
فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

হজ্জের মাস সমূহ সুবিদিত; অতএব , যে কেহ ইহার মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তাহা হইলে হজ্জের মধ্যে না স্ত্রী-গমন, না অপকর্ম এবং না কলহ-বিবাদ করা যাইবে।

(আল-বাকারা: ১৯৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 24
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 14 ই জুন, 2018 29 রমযান 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যবৃন্দ হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং তাঁর যাবতীয় মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করিবে যেন তোমরা আল্লাহতালাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। যাহারা যাকাত দিবার উপযুক্ত তাহারা যাকাত দিবে। যাহাদের জন্য হজ্জ্ ফরয হইয়াছে এবং তাহা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে তাহারা হজ্জ্ করিবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে এবং পাপকে ঘৃণার সহিত বর্জন করিবে

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দুনিয়া বহু বিপদের স্থান, তন্মধ্যে প্লেগও একটি। অতএব নিষ্ঠার সহিত তোমরা তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধর যেন তিনি এই বিপদাবলী তোমাদের নিকট হইতে দূরে রাখেন। আকাশ হইতে আদেশ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াতে কোন বিপদ দেখা দেয় না এবং কোন দুর্দশা দূরীভূত হয় না যে পর্যন্ত না আকাশ হইতে তাঁহার দয়া বর্ষিত হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহাই যে, তোমরা শাখাকে না ধরিয়া মূলকে অবলম্বন কর। ঔষধ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু উহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা নিষেধ। খোদাতালার যাহা ইচ্ছা পরিশেষে উহাই ঘটিবে। যদি কেহ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতার সামর্থ্য রাখে তাহা হইলে সেই নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ। তোমাদের জন্য আর একটি জরুরী শিক্ষা এই যে, কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত জিনিষের মত ফেলিয়া রাখিও না, কারণ ইহাতেই তোমাদের জীবন নিহিত রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান দান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে। যাহারা প্রত্যেক হাদীস ও উক্তির উপর কুরআনকে প্রাধান্য দান করিবে, আকাশে তাহাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই। অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সহিত সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার।

স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে। মুক্তি প্রাপ্ত কে? সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার ও তাঁহার সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যবর্তী শাফী এবং আকাশের নীচে তাঁহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট অপর কোন রসূল নাই। কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কাহাকেও খোদাতালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত। তাঁহার চিরকাল জীবিত থাকার জন্য খোদাতালা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীয়ত ভিত্তিক আধ্যাত্মিক কল্যাণকে কেয়ামত পর্যন্ত জারী রাখিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার রূহানী কল্যাণধারায় খোদাতালা এই প্রতিশ্রুত মসীহকে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহার আগমন ইসলামের সৌধটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য জরুরী ছিল। কেননা, দুনিয়া লয় প্রাপ্তির পূর্বে মুহাম্মদী সিলসিলার জন্য আধ্যাত্মিক গুণের একজন মসীহ্‌কে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল যেরূপ মূসায়ী সিলসিলার জন্য তাহা করা হইয়াছিল। এই তত্ত্বের দিকে (কুরআন শরীফের) এই আয়াত ইঙ্গিত করিতেছেঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(সূরা ফাতেহা ৬-৭ আয়াত)

(অর্থাৎ তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ।)

হযরত মূসা (আ.) তাঁহার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের হারানো ধন পাইয়াছিলে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই ধনের অধিকারী হইয়াছেন যাহা হযরত মূসা (আ.)-এর অনুগামীগণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদী সিলসিলা মূসায়ী সিলসিলার স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু মর্যাদায় উহা হইতে সহস্র গুণে উচ্চ। মূসা সদৃশ (হযরত মুহাম্মদ-সা.) যেমন মূসা (আ.) হইতে মর্যাদায় উচ্চতর তদ্রূপ মরিয়ম তনয় ঈসা সদৃশ (প্রতিশ্রুত মসীহ) মরিয়ম তনয় ঈসা হইতে মর্যাদায় উচ্চতর। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ শুধু কালের দিক দিয়াই আঁ-হযরত (সা.) এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন নাই যেরূপ মসীহ ইবনে মরিয়ম মূসা (আ.) এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করিয়াছিলেন* বরং তিনি বর্তমানে এমন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে যখন মুসলমান জাতির অবস্থা হযরত ঈসা

এরপর সাতের পাতায়.....

১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

হুযুর বলেন এটি খুবই সামান্য বিষয় যা বড় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বুঝতে পারি না যে, যদি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন না করি তবে কি দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে? এই কাজের ফলে দেশের উন্নতির গতি কি বৃদ্ধি পাবে? এগুলি মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। আমি বুঝতে পারছি না রাজনীতিক নেতা এবং রাজনীতিবিদরা কেন এই বিবাদে লিপ্ত হচ্ছেন? শত সহস্র সমস্যাবলী রয়েছে যেগুলি তুলনায় এর থেকে বেশি গুরুতর। হাজার হাজার মানুষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করছে, এমনকি এখানে সুইডেনেও একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে জীবন অতিবাহিত করছে। আপনারা সেই সমস্ত অভুক্তদেরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কেন বিচলিত হন না? আপনারা এমন মানুষদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা সুযোগ করে দেন না কেন? মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করা গুরুতর বিষয় নয়। এগুলিই হল আসল বিষয়। এগুলি নিয়ে আলোচনা হয় না কেন? মানুষ ডাস্টবিনে কেন খাদ্য অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে?

সংবাদ প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন: আপনি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করবেন কি না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না। কেননা, আমি একজন ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক এবং নিজের ধর্মীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধ।

হুযুর বলেন: পৃথিবীতে অনেক গোষ্ঠী এবং ধর্মের মানুষ আছে, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি আছে। তারা সকলে করমর্দন করে না। হিন্দুদের নিজস্ব রীতি আছে। তারা করজোড়ে নমস্কার করে। জাপানীদের ভিন্ন রীতি রয়েছে, তারা কেবল আলতোভাবে নুইয়ে পড়ে। আফ্রিকাতেও কিছু গোষ্ঠী প্রধান রয়েছে যারা করমর্দন করে না, এমনকি অপরের উপস্থিতিতে খাদ্যগ্রহণও করে না। আমরা তাদেরকে ভুল বলতে পারি না।

হুযুর বলেন: আমি যদি দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি যত্নবান হই, দেশকে ভালবাসি, দেশের অগ্রগতিকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করি এবং এর জন্য নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত করি, তবে আমাকে এমন ব্যক্তি মনে করা হবে না যে সমাজের সঙ্গে সমন্বিত হচ্ছে না। দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রকাশের জন্য মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করা বা সুরাপান করা আবশ্যক নয়। অনেক খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা মদ্যপান করেন না বা পানশালায় যান না। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে তারা সমাজের অংশ নয়? ইহুদীদের মধ্যে মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করা নিষিদ্ধ। একথা ভিন্ন বিষয় যে তারা এটি মেনে চলে না। এই একই কাজ যদি কোন ইহুদী করে তবে আপনারা সেটিকে নিয়ে এতটা বাক-বিতণ্ডা করেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলাকে anti-semitism তকমা লাগিয়ে দেন। কিন্তু যেহেতু এইকাজ একজন মুসলমান করেছে তাই সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

প্রতিনিধি বলেন: কট্টর ইসলাম এবং মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করা বা না করা- এমন প্রশ্ন শুনে আপনি নিশ্চয় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

হুযুর বলেন: ইসলামকে কট্টর নামে অভিহিত করা বা ইসলামের কট্টর হওয়া একটি বিরাট সমস্যা। এর কারণে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। যদি কোন সুইডিশ মুসলমান কট্টরপন্থী হয় তবে তা কেবল সুইডেনের জন্যই চিন্তার বিষয় নয়, বরং তা গোটা পৃথিবীর যে কোন দেশের জন্য বিপদ। যেমন এখান থেকে এক সুইডিশ ব্রাসেলসে গিয়েছিল। অতএব যদি মালমোতে এক ব্যক্তি কট্টরপন্থী হয় তবে তা কেবল মালমো নয় বরং গোটা পৃথিবীর জন্য বিপদের কারণ হবে। যদি কেউ দক্ষিন আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায় কট্টরবাদীতে পরিণত হয় তবে তা তারা সমগ্র বিশ্বের জন্যই বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। যদি কেউ ইরান, আদান, সিরিয়া বা মিশরে কট্টরবাদীতে পরিণত হয় তবে গোটা পৃথিবীর জন্য বিপদ। তাই এটি অনেক বড় সমস্যা এবং বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে এর সমাধান করতে হবে। করমর্দনের বিষয়টির সঙ্গে এটির তুলনা করতে পারবেন না। রাজনীতিকরা শুধুমাত্র মানুষের মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিষয়টি উত্থাপন করেছে।

এরপর প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন: সমকামিতা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? যদি কেউ সমকামি বা সমকামিতার পক্ষপাতি হয় তবে কি সে এই নতুন মসজিদটিতে আসতে পারে?

হুযুর বলেন: কুরআন করীমের তুলনায় বাইবেলে সমকামিতার বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আপনি যদি প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টধর্মাবলম্বী হন তবে এই কাজটিকে আপনি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনি লুত জাতির পরিণামও দেখেছেন যাদেরকে শাস্তি প্রদান করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এর বিবরণ বাইবেলেও লিপিবদ্ধ আছে। আপনি যদি খোদায় বিশ্বাসী হন এবং মনে করেন যে, বাইবেলে যা কিছু লেখা আছে তা সত্য তবে বাইবেল বলছে এদেরকে তাদের অপকর্মের পরিণামে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এই যুগের মানুষকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে না? দ্বিতীয় কথা হল, আমাদের মধ্যে যদি কেউ সমকামি হয়ও তবে তার নিজেকে সমকামি বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া কি আবশ্যক? যদি কেউ প্রকাশ্যে নিজেকে সমকামি বলে ঘোষণা করে তবে আমরা তাকে এই মসজিদে আসতে বাধা দিব না। কিন্তু তার প্রতি সহানুভুতি দেখিয়ে আমরা তাকে অব্যশই বলব যে, তার নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা উচিত। অন্যথায় কুরআন এবং বাইবেলে শিক্ষা অনুসারে সে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির কবলে পড়বে। বর্তমানে মনোঃস্তত্ত্ববিদরাও একথা স্বীকার করছে এবং বলছে যে, এটি একটি মানসিক রোগ যার চিকিৎসা বিদ্যমান। কিন্তু সমকামিতা সম্পর্কে প্রণীত আইনের কারণে তারা চুপ করে আছে। দেখুন, যখন এই আইন তৈরী হয় নি তখনও সমকামিরা ছিল, কিন্তু এরা তারাই যারা শৈশবে কোন মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যার কারণে তারা এমন হয়ে গেছে। কিন্তু বিভিন্ন এসেম্বলীর পক্ষ থেকে আইন পাস হওয়ার পর এমন মানুষও সমকামিদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে যাদের শৈশবে কোন মানসিক সমস্যা ছিল না। আর কেবল নিজেদের (বিকৃত) কামবাসনা চরিতার্থ করতে এদিকে পা বাড়াচ্ছে। আপনি যদি সমকামিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন যে, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সে গিয়ে সমস্যা তৈরী হওয়া আরম্ভ হচ্ছে এবং সেই সময় তারা নিজেদের সঙ্গীকে ত্যাগ করতে চাইছে। অনেকে যারা পরিণত বয়সে সমকামিদের ক্লাবে যোগ দেয়, তাদের অনেকে আবার বিবাহিতও হয়ে থাকে, যাদের স্ত্রীরাও উদ্বিগ্ন থাকে আর অভিযোগ করে যে, এরা আমাদের বিবাহিত জীবনে শেষ করে দিয়েছে। এমন মানুষেরা পূর্বে কখনও সমকামিতার দিকে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না; কিন্তু এখন কেবল নিজেদের কামবাসনার কারণে সমকামি ক্লাবে যেতে শুরু করেছে।

সংবাদ প্রতিনিধি বলেন: এটা তো কেবল তাদের জন্য যারা ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু অনেকে তো ধর্মই মানে না।

হুযুর বলেন: আমি কিছু এমন সমকামিকে চিনি যারা মুসলমান। আমি তাদেরকে বললাম যে নিজেদের চিকিৎসা করাও। চিকিৎসার ফলে তারা সুস্থ হয়ে উঠেছে। তারা নিজেদের সমকামি সঙ্গীদের মাধ্যমে নিজেদের কাম চরিতার্থ করা ত্যাগ করেছে এবং মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ করে। এখন তারা মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আনন্দে আছে ।

প্রতিনিধি বলেন: এমন মানুষদের সম্পর্কে আপনার চিন্তা ধারা কিরূপ?

হুযুর বলেন: আমি এমন মানুষদের প্রতি সহানুভুতি পোষণ করি। আমি যেহেতু জানি যে, খোদা তা'লা এমন মানুষদের শাস্তি দিবেন, তাই আমি তাদের প্রতি সহানুভুতির কারণে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। আমি এমন মানুষদের ঘৃণা করি না। এদের মধ্যে যদি কেউ আমাদের মসজিদে এসে দোয়া করতে চায় তবে আসতে পারে। আমি তাদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিব না।

নুরুল ইসলামের সময়

প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত (শুক্রবার ছুটির দিন)

ফোন নম্বর : 1800 3010 2131

এই টোল ফ্রী নম্বরে ফোন করে আপনি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে বিশদে জানতে পারেন

জুমআর খুতবা

রসুলে করীম (সা.)-এর সাহাবা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ, হযরত কাব বিন যায়েদ, হযরত সালেহ শুকরান এবং হযরত মালিক বিন দুখশম (রা. আজমাঈন)-এর জীবনী, ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা এবং জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ১১ ই মে , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১১ হিজরত , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:আজকে আমি যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্ব প্রথম হলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ। তাঁর মা উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর ফুফু ছিলেন আর এভাবে তিনি মহানবী (সা.)-এর পিসতুতো ভাই ছিলেন। মহানবী (সা.) দারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৯, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ)

দারে আরকাম হলো সেই স্থান বা কেন্দ্র যা এক নবমুসলিম আরকাম বিন আরকামের বাসস্থান ছিল। মুসলমানরা সেখানে সমবেত হতো। এটি মক্কা থেকে কিছুটা বাইরে ছিল। ধর্ম শেখার জন্য এবং ইবাদত ইত্যাদি করা জন্য এটি একটি কেন্দ্র ছিল। এই খ্যাতির কারণেই এর নাম দারুস সালাম হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিন বছর পর্যন্ত মক্কায় এটি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুসলমানরা নীরবে সেখানে ইবাদত করতেন আর মহানবী (সা.)-এর বৈঠক বসত। এরপর হযরত উমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মুসলমানরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। রেওয়ায়েত বা বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর এ কেন্দ্রে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি ছিলেন।

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, প্রণেতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ১২৯

যাহোক, এই জায়গাটি কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্ণনা অনুসারে কুরাইশের জুলুম এবং অত্যাচার থেকে তাঁর বংশও নিরাপদ ছিল না। তিনি তার উভয় ভাই হযরত আবু আহমদ এবং উবায়দুল্লাহ্ আর তার বোন জয়নব বিনতে জাহাশ, হযরত উম্মে হাবীবা এবং হযরত হামনা বিনতে জাহাশের সাথে দুইবার ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করেন। তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহ্ ইথিওপিয়ায় গিয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল আর সেখানেই খ্রিষ্টান অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, অথচ তার স্ত্রী আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবা তখনো ইথিওপিয়াতেই ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) তাকে বিয়ে করেন।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৯, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ মদীনায় হিজরতের পূর্বে ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় আসেন, এখান থেকে তাঁর গোত্র বনুগানামে দুদানের সবাইকে, যারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সাথে নিয়ে মদীনায় চলে যান। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে গিয়ে মক্কাকে এমনভাবে খালি করে দেন যে, পুরো পাড়া জনশূন্য হয়ে যায়। অনেক ঘর খালি হয়ে যায়।

(আততাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯)

পাকিস্তানের কোন কোন স্থানে আহমদীরা আজকাল এই অবস্থারই সম্মুখীন, কোন কোন গ্রাম খালি হয়ে গেছে। ইবনে ইসহাক বলেন, বনু জাহাশ বিন রেয়াব যখন মক্কা থেকে হিজরত করে তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের ঘরবাড়ি আমর বিন আলকামার কাছে বিক্রি করে দেয়। এই সংবাদ যখন মদীনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের কাছে পৌঁছে তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে এ কথা নিবেদন করলে মহানবী (সা.) বলেন, হে আব্দুল্লাহ্ ! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, খোদা তা'লা এর বিনিময়ে তোমাকে জান্নাতে প্রাসাদ দিবেন? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশবলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি এতে সন্তু ষ্ট। তিনি (সা.) বলেন, অতএব সেই প্রাসাদ তোমার জন্য রয়েছে। (সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ৩৫২) অর্থাৎ যে ঘরবাড়ি তোমরা ছেড়ে এসেছ তার পরিবর্তে তোমরা জান্নাতে স্থান পাবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য প্রাসাদ নির্মিত হবে।

মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে নাখলা উপত্যকার দিকে এক সেনাদলে পাঠান। বিভিন্ন পুস্তকে এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, রসূলে করীম (সা.) একদিন এশার নামায শেষ করেন, এরপর তিনি (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে বলেন, প্রভাতে নিজের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসবে, তোমাকে এক জায়গায় পাঠাব। হুযূর (সা.) যখন ফযরের নামায শেষ করেন তখন তিনি

(সা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশকে তার তির, তূণ, বর্ষা এবং বর্মসহ নিজের ঘরের দরজায় অপেক্ষমান পান। মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কাবকে ডেকে পাঠান এবং তাকে এক পত্র লেখার নির্দেশ দেন। সেই পত্র যখন লেখা হয় তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে ডেকে সেই পত্র তার হাতে দিয়ে তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাকে এই দলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করছি। অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে যেই দল বা প্রতিনিধি দলকে পাঠানো হয়েছিল। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, এর পূর্বে তিনি এই জামা'তের দায়িত্বে হযরত উবায়দা বিন হারেসকে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি যখন বিদায়ের জন্য ঘরে যান তখন তার সন্তানসন্ততি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে কান্নাকাটি করা আরম্ভ করে, তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে তার জায়গায় আমীর নিযুক্ত করে পাঠান। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে পাঠানোর সময় মহানবী (সা.) তাকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত করেন, সীরাতুল হালবিয়াতে এটি লেখা রয়েছে। এভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ সেই প্রথম সৌভাগ্যবান সাহাবী যার জন্য ইসলামী যুগে আমীরুল মু'মিনীন উপাধি নির্ধারণ করা হয়েছে। (আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেন যে,

মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন এরপরও মক্কাবাসীদের ক্রোধের মাত্রা প্রশমিত হয় নি বরং তারা মদীনাবাসীদের হুমকি ধমকি দিতে থাকে যে, তোমরা যেহেতু আমাদের লোকদেরকে তোমাদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছ তাই তোমাদের জন্য এখন একটি রাস্তাই খোলা আছে, হয় এদের সবাইকে হত্যা কর আর না হয় তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দাও। অন্যথায় আমরা কসম খেয়ে বলছি যে, আমরা মদীনায় হামলা করব আর তোমাদের সবাইকে হত্যা করে তোমাদের মহিলাদের করায়ত্ব করব আর এরপর শুধু হুমকি ধমকি পর্যন্তই তারা সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং মদীনায় হামলা করার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করে। সেই যুগে মহানবী (সা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, অনেক সময় তিনি সারারাত জেগে কাটাতেন। একইভাবে সাহাবীরা রাতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘুমাতেন যে, কোথাও রাতের অন্ধকারে শত্রু হামলা না করে বসে। এমতাবস্থায় রসূলে করীম (সা.) একদিকে মদীনার চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ করেন যে, যদি এমন পরিস্থি তি দেখা দেয় তাহলে তারা মুসলমানের সঙ্গ দিবে। অপর দিকে কুরাইশরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে– এসব সংবাদের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) হিজরতের দ্বিতীয় বছরে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে বারো জন ব্যক্তির সাথে নাখলা প্রেরণ করেন আর তাকে একটি পত্র দিয়ে বলেন, এ পত্রটি যেন দুদিন পর খোলা

হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ দুদিন পর সেই পত্র খুলেন, তাতে লেখা ছিল তুমি নাখলায় অবস্থান কর আর কুরাইশের গতিবিধির সংবাদ নিয়ে আমাদেরকে অবহিত কর। ঘটনাচক্রে ইত্যবসরে কুরাইশের একটি ছোট্ট দল সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে ফিরে আসছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের ওপর হামলা করে বসেন, এর ফলে কাফেরদের একজন আমর বিন আল হাজরামী নিহত হয় এবং দুজন গ্রেফতার হয় আর মালে গণিমতও মুসলমানেরা করায়ত্ব করে নেয়। মদীনায় ফিরে এসে তিনি যখন মহানবী (সা.) কে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন তখন তিনি (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিই নি আর মালে গণিমত নিতেও তিনি অস্বীকৃতি জানান।

ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাসের বরাতে লিখেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তার সাথীরা যে ভুল করেছে তা হলো, তারা ধরে নিয়েছে তখনো রজব মাস আরম্ভ হয় নি, অথচ রজব মাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে, এটি ছিল ত্রিশ জমাদিউস সানী, রজব আরম্ভ হয় নি। যাহোক মুসলমানদের হাতে আমর বিন হাজরামী নিহত হওয়ার কারণে পৌত্তলিকেরা হইচই আরম্ভ করে যে, মুসলমানরা সেসবপবিত্র মাসের পবিত্রতারও পরোয়া করে না যাতে সকল প্রকার যুদ্ধ বন্ধ থাকত। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এই আপত্তিরই খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, নিঃসন্দেহে এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করা খুবই অপছন্দনীয় কাজ এবং খোদার দৃষ্টিতে পাপ কিন্তু এর চেয়েও ঘৃণ্য বিষয় হলো মানুষকে খোদার পথে বাধা দেওয়া এবং আল্লাহ্‌র তৌহিদকে অস্বীকার করা আর মসজিদে হারামের সম্মানকে পদদলিত করা এবং এর অধিবাসীদের শুধু এই দোষে নিজেদের ঘর থেকে বহিষ্কার করা যে, তারা আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান এনেছিল। একটি কথা তোমাদের মনে পড়ল কিন্তু এই কথা চিন্তা কর নি যে, তোমরা নিজেরা কত বড় অপরাধ করছ? আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে আর মসজিদে হারামের সম্মান পদদলিত করে এর অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে কত অপছন্দনীয় কাজ করেছ। যেখানে তোমরা নিজেরাই এসব অপকর্ম করেছ সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন মুখে আপত্তি কর? এরা তো না জেনে একটি ভুল করেছে কিন্তু তোমরা তো জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে এসব কিছু করছ।

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৪-৪৭৫)

বুখারীর একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ শাহ্ সাহেব আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের এই যুদ্ধাভিযানের ইতিবাচক ফলাফলের উল্লেখ করতে গিয়ে এর ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, ঘটনা প্রবাহ বলে যে, এই প্রতিনিধি দলকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল তাতে তারা পুরো সাফল্য পেয়েছেন আর তারা বন্দীদের মাধ্যমে মক্কার কুরাইশদের ষড়যন্ত্র এরং তাদের গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ অবগত হন। হাজরামীর কাফেলা–সংক্রান্ত ঘটনাটি একটি কাকতালীয় বিষয় ছিল। আর কোন কোন ইতিহাসবিদ এই যে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, এই অভিযানে কতক সদস্যের মাঝে মুহাজেরদের হারানো ধনসম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল- এটি সঠিক নয়, বরং এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হাজরামী–সংক্রান্ত কাফেলার মাধ্যমে আবু সুফিয়ান বিন হারবের নেতৃত্বে পরিচালিত কাফেলার উদ্দেশ্য এবং মক্কার কুরাইশের যুদ্ধ সম্পর্কিত ষড়যন্ত্রের বিষয়ে যেন পূর্ণ জ্ঞান অর্জন হয় আর গোপনে এই দায়িত্বই তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তাই তারা এই ছোট্ট কাফেলাকে ধরে নিয়ে আসার সুযোগ হাত ছাড়া করে নি। এটি একটি অবাস্তব ধারণা যে, তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল মক্কার কুরাইশদের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কিন্তু তারা কাফেলা লুট করে রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে ফিরে আসাকে যথেষ্ট মনে করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ খুবই উচ্চমার্গের একজন সাহাবী ছিলেন আর রসূলে করীম (সা.)-এর ফুপাত ভাইও ছিলেন। তিনি (সা.) একজন বিশ্বস্ত ও গোপনীয়তা রক্ষাকারী ব্যক্তিকে এই অভিযানের জন্য বেছে নিয়েছেন। রসূলে করীম (সা.) যখন মক্কার কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনিও প্রস্তুতি আরম্ভ করেন আর এ প্রস্তুতিতে তিনি পুরো গোপনীয়তা রক্ষা করেন।

(সহী বুখারী থেকে সংকলিত, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ্ শাহ সাহেব, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫, কিতাবুল মাগাযী)

তিনি লিখেছেন যে, মাগাযিতেএমন ঘটনাবলী এসেই থাকে অর্থাৎ যুদ্ধ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তারা সাথিদের প্রতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই অসন্তোষ এদিক থেকে যুক্তিযুক্ত ছিল যে, তাদের অভিযানে এমন ঘটনা সামনে আসে যা নৈরাজ্যের কারণ হতে পারত। কিন্তু অনেক সময় কিছু বিষয় বাহ্যতঃ ভুল মনে হলেও তা ঐশী ইচ্ছার অধীনে ঘটে থাকে আর কিছু ছোট ছোট ঘটনা অসাধারণ ফলাফলে পর্যবসিত হয়। তাই যদি হযরত আব্দুল্লাহ্‌বিন জাহাশের নেতৃত্বাধীন দলকে অভিযানে প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের দ্বারা যা কিছু ঘটেছে তা না ঘটত আর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে আগত বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যেত তাহলে কুরাইশদেরসেই বাণিজ্য কাফেলাকে কাজে লাগিয়ে অনেক বড় প্রস্তুতির সাথে মুসলমানদের ওপর হামলা করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। যার মুখোমুখি হওয়া সহায়সম্বলহীন সাহাবীদের জন্য অসম্ভব ছিল। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ –সংক্রান্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে কুরাইশের অহংকারী নেত্রীবৃন্দ তেলে–বেগুনে জ্বলে উঠে আর এই আক্রোশ ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে তড়িঘড়ি করে এক হাজার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে নিজেদের কাফেলা রক্ষার উদ্দেশ্যে বদর প্রান্তরে পৌঁছে। তারা এটি জানত না যে, সেখানেই তাদের মৃত্যু অবধারিত। অপর দিকে এই আশঙ্কাও ছিল যে, সাহাবীরা যদি এটি জানতে পারতেন যে, একটি সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলার জন্য তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে তাদের কতক দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যেত। তাই গোপনীয়তার সাথে সেই কাজ করা হয়েছে, যা যুদ্ধের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষাব্যূহের কাজ করে থাকে, যুদ্ধের পরিভাষায় যাকে আজকাল camouflage বলা হয়ে থাকে।

(সহী বুখারী থেকে সংকলিত, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ্ শাহ সাহেব, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭, কিতাবুল মাগাযী)

ইতিহাসে লেখা আছে, "খোদা এবং রসূলের প্রেম তাদেরকে জগতের প্রতি বিমুখ করে রেখেছিল। তাদের একটিই বাসনা ছিল যে, আমরা যেন নিজেদের প্রিয় জীবন খোদার পথে উৎসর্গ করতে পারি। তাদের এ বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আর দআল মুজাদ্দা ফিল্লাহ্ (খোদার পথে যাদের কান কর্তিত হয়েছে) নামের এক অনন্য নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।"

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের দোয়া কীভাবে গৃহীত হতো এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর শাহাদতের পূর্বের দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। ইসহাক বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আমার পিতা অর্থাৎ সাদকে ওহুদের যুদ্ধের দিন বলেন যে, এসো! খোদার কাছে দোয়া করি। তাই তারা উভয়ে এক পাশে চলে যান। প্রথমে সাদ দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! কালকে শত্রুর সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হবে তখন আমি যেন এমন ব্যক্তির মুখোমুখি হই, যে হবে আক্রমণে কঠোর এবং প্রতাপান্বিত আর আমি যেন তার সাথে যুদ্ধ করে তোমার খাতিরে তাকে হত্যা করি, তার অস্ত্র শস্ত্র হস্তগত করি। আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আমীন বলেন। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! কাল আমার সামনে যেন এমন ব্যক্তি আসে যে হবে আক্রমণে কঠোর এবং খুবই প্রতাপান্বিত, আর আমি যেন তোমার খাতিরে তার সাথে যুদ্ধ করি এবং সে যেন আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় আর জয়যুক্ত হয়ে আমাকে হত্যা করে আর আমাকে ধরে আমার নাক এবং কান কেটে ফেলে। আর আমি যখন তোমার দরবারে উপস্থিত হব তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আব্দুল্লাহ্! কার খাতিরে তোমার নাক এবং উভয় কান কর্তিত হয়েছে। তখন আমি বলব, তোমার এবং তোমার রসূল (সা.)-এর পথে। প্রত্যুত্তরে তুমি বলবে, তুমি সত্য বলেছ। হযরত সাদ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের এই দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উন্নত ছিল। তাই আমি শেষ দিন দেখেছি তার নাক এবং উভয় কান কাটা আর সেগুলো একটি সুতোয় গেঁথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ)

এই পাশবিক কার্যকলাপ কাফেররা করত আর আজকাল কতক কট্টরপন্থী মুসলমানও ইসলামের নামে এটিই করছে।

হযরত মুত্তালেব বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেদিন ওহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সেদিন তিনি (সা.) শেয়খাইন নামে মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় রাতের বেলায় অবস্থান করেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) একটি কষা ছাগলের পা আনেন, যা থেকে মহানবী (সা.) আহার করেন। একইভাবে 'নাবীজ' আনা হলে তিনি (সা.) 'নাবীজ'ও পান করেন। আমার মনে হয় এটি এক প্রকার পানীয় হবে। এরপর এক ব্যক্তি সেই নাবীজপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে যায় এবং তা থেকে কিছুটা পান করে। এরপর

সেই পেয়ালা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ নেন এবং পুরোটাই পান করে ফেলেন। এক ব্যক্তি বলেন, কিছুটা আমাকেও দাও। তুমি কি জান, কাল প্রভাতে তুমি কোথায় যাবে? এটি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে বলেন তিনি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ বলেন, হ্যাঁ, আমি জানি, আল্লাহ্র সাথে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করার চেয়ে পরিতৃপ্ত অবস্থায় মিলিত হওয়া আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫০)

খোদা তা'লাকে ভালোবাসার অদ্ভুত রীতি ছিল সাহাবীদের আর এর জন্য তাদের প্রস্তুতির ধরণও ছিল অভিনব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং হযরত হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে। হযরত হামজা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের খালু ছিলেন। শাহাদতের সময় তার বয়স চল্লিশোর্ধ ছিল। মহানবী (সা.) তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ওলী হন এবং তার পুত্রকে খায়বারে সম্পদ ক্রয় করে দেন।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ সুচিন্তিত এবং সঠিক মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে যেসব সাহাবীদের পরামর্শ নিয়েছেন তাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের বোনের একটা ঘটনা বর্ণনা করেন, যা ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন যে, এ যুদ্ধে অর্থাৎ ওহুদের যুদ্ধে আমরা দেখি যে, মহানবী (সা.) কীভাবে দৃঢ় মনোবল এবং উন্নত চারিত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের মন জয় করেছেন। এ যুদ্ধ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি উন্নত নৈতিক চরিত্রের মহান মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন আর এই যুদ্ধে সাহাবীদের অভূতপূর্ব কুরবানীর ঘটনাও দেখা যায়। তিনি বলেন, আমি সেই সময়কার কথা বলছি যখন যুদ্ধ শেষে তিনি মদীনায় ফিরে আসছিলেন, মদীনার মহিলারা তার শাহাদতের ঘটনা শুনে ব্যাকুল ছিলেন, এখন তারা তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য মদীনা থেকে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে আসেন, তাদের মাঝে একজন ছিলেন তার শ্যালিকা হিমনা বিনতে জাহাশও ছিলেন। তাঁর খুবই কাছের তিন আত্মীয় যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁকে দেখে বলেন, তোমার প্রয়াত আত্মীয়দের জন্য কাঁদো বা দুঃখ প্রকাশ কর। এটি আবরী ভাষার একটি বাগধারা, এর অর্থ হলো আমি তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি যে, তোমার প্রিয়জন মারা গেছেন। জয়নাব বিনতে জাহাশ বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কোন মৃত আত্মীয়ের জন্য ক্রন্দন করব? তিনি বলেন, তোমার মামা হামজা শাহাদত বরণ করেছেন। এটি শুনে হযরত জয়নাব বলেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ এরপর বলেন, খোদা তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, কতই না উত্তম মৃত্যু তিনি বরণ করেছেন! মহানবী (সা.) আবার বলেন, তোমার আরেক প্রয়াত আত্মীয়ের জন্য ক্রন্দন কর। হিমনা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কার জন্য? তিনি বলেন, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশও শাহাদত বরণ করেছেন। হিমনা পুনরায় إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়েন এবং বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি তো খুবই সুন্দরভাবে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বলেন, হিমনা! তোমার আরেক প্রয়াত আত্মীয়ের জন্য তুমি ক্রন্দন কর। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কার জন্য? তিনি বলেন, তোমার স্বামীও শাহাদত বরণ করেছেন। এটি শুনে হিমনার চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে যায়, এটি শুনে জয়নাব বলেন, পরিতাপ। এটি দেখে মহানবী (সা.) বলেন, দেখ! একজন মহিলা তার স্বামীর সাথে কত গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে। আমি হিমনাকে যখন তার মামার শাহাদাতের সংবাদ দিলাম তখন সে বলল, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। আমি যখন তাকে তার ভাইয়ের শাহাদতের সংবাদ দেই সে পুনরায় إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে, কিন্তু যখন আমি তাকে তার স্বামীর শাহাদতের সংবাদ দিই তখন সে নিদারুন কষ্টে বলে, হায় পরিতাপ, আর সে তার অশ্রু সংবরণ করতে পারে নি এবং ভয় পেয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, মহিলা এমন সময় সবচেয়ে প্রিয় এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে ভুলে যায় কিন্তু যে স্বামী তাকে ভালোবাসে তার কথা মনে থাকে। এরপর তিনি হিমনাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে হায় পরিতাপ! কেন বললে? হিমনা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তখন আমার তার সন্তানের কথা মনে পড়ে যে, কে তার দেখা শোনা করবে?"

(এখানে স্বামীর ভালোবাসা নিজের জায়গায়, স্বামী যদি ভালোবাসে তাহলে স্ত্রী স্মরণ রাখে। কিন্তু তিনি সন্তানদের ব্যাপারেও চিন্তিত ছিলেন আর এ কথাই তিনি প্রকাশ করেছেন। এতে বর্তমান যুগের পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই শিক্ষনীয় দিক রয়েছে। অর্থাৎ স্বামী যেন এমন হয় যারা ভালোবাসে আর মহিলারা যেন সন্তানদের ক্ষেত্রে সচেতন মা হন। প্রেমিক স্বামী হতে হলে স্ত্রী-সন্তানের অধিকার আদায় করাও আবশ্যক। আজকাল এ-সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ আসে যে, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করা হচ্ছে না। মহনবী (সা.)ও কত সুন্দর কথা বলেছেন দেখুন!) তখন তিনি হিমনাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি খোদার কাছে দোয়া করি তিনি যেন তোমার স্বামীর চেয়ে অধিক যত্নবান কোন ব্যক্তি দাঁড় করান। অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রতি যত্নবান উত্তম কোন ব্যক্তি যেন দণ্ডায়মান হন। এই দোয়ার ফলশ্রুতিতেই হযরত জয়নাব (রা.)-এর বিয়ে হযরত তালহার সাথে হয় আর তাঁর ঘরে মুহাম্মদ বিন তালহার জন্ম হয়। ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তালহা তার নিজের পুত্র মুহাম্মদের প্রতি ততটা ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শন করতেন না যতটা হিমনার পূর্বের সন্তানদের প্রতি প্রদর্শন করতেন। মানুষ বলতো যে, তালহার চেয়ে বেশি ভালোবাসার সাথে অন্যের সন্তানদের পালন করবে এমন আর কেউ নেই। এটি মহানবী (সা.)-এর দোয়ারই ফসল ছিল।"

(আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৫৬-৫৭)

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হচ্ছে হযরত কাব বিন জায়েদ (রা.)-এর। তিনি সাহাবী ছিলেন। তাঁর নাম হলো কাব বিন জায়েদ বিন কায়েস বিন মালেক। বনু নাজ্জারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হযরত কাব (রা.) বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন আর পরিখার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। বলা হয় উমাইয়া বিন রাবিয়া বিন সাখ্খারের তির লেগেছিল তাঁর শরীরে। তিনি বে'রে মাওনার সাহাবীদের একজন ছিলেন যেখানে তার সব সাথি শাহাদত বরণ করেন, কেবল তিনিই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৬)

বে'রে মাওনা সেই জায়গা যেখানে মহানবী (সা.) এক গোত্রের অনুরোধে তাঁর সত্তর জন সাহাবীকে প্রেরণ করেছিলেন, যাদের অনেকেই ছিলেন হাফেজে কুরআন এবং ক্বারী। তারা প্রতারণামূলকভাবে হযরত কাব ব্যতীত ছাড়া তাদের সবাইকে শহীদ করে। আর হযরত কাবও বে'রে মাওনার এই ঘটনায় এই কারণে রক্ষা পান কেননা, তিনি তখন পাহাড়ে চড়ে যান। কতক ঘটনা অনুসারে কাফেররা আক্রমণ করে তাকেও গুরুতরভাবে আহত করে এবং তাকে মৃত মনে করে রেখে চলে যায় কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন আর কোনভাবে মদীনায় ফিরে আসেন, এরপর তিনি জীবন ফিরে পান এবং সুস্থ হয়ে উঠেন।

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, প্রণেতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব)

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো হযরত সালেহ্ শুকরান (রা.)-এর। তাঁর নাম ছিল সালেহ্ আর উপাধী ছিল শুকরান এবং এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। হযরত সালেহ্ শুকরান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আউফের ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে তাঁর সেবার জন্য পছন্দ করেন আর হযরত আব্দুর রহমানকে মূল্য দিয়ে তাকে ক্রয় করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ তাকে বিনামূল্যে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থাপন করেন।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯২, শুকরান)

হযরত সালেহ্ শুকরান বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি যেহেতু তখনো ক্রীতদাস ছিলেন, স্বাধীনতা পান নি, তাই মহানবী (সা.) তার জন্য কোন অংশ বা 'মালে গনিমতের' অংশ নির্ধারণ করেন নি। মহানবী (সা.) সালেহ্ শুকরানকে বন্দীদের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করেন। হযরত সালেহ্ শুকরান যেসব লোকের নিগরানি করতেন তারা তাদের মুক্তির জন্য বিনিময়মূল্য প্রদান করত। এভাবে তিনি মালে গনিমতের চেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করেন। অর্থাৎ মালে গনিমতের অংশ পান নি কিন্তু এই তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতিতে মালে গনিমতের চেয়ে বেশি সম্পদ লাভ করেন। বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দেন।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯২, শুকরান)

হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ সাদেক বলেন, হযরত শুকরান সুফ্ফাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (হালীইয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৮) অর্থাৎ তিনি তাদের একজন ছিলেন, যারা সব সময় মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে থাকতেন। হযরত শুকরানের আরেকটি সৌভাগ্য হয়েছে আর তা হলো মহানবী (সা.) কে গোসল দেওয়া এবং তাঁর দাফন কাফনে যোগ দেওয়া।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৪, শুকরান)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, মহানবী (সা.) কে তাঁর পরিধেয় কাপড়েই গোসল দেওয়া হয়েছে আর তাঁর কবরে হযরত আলী, হযরত ফযল বিন আব্বাস, হযরত কসুম বিন আব্বাস, হযরত শুকরান এবং অওস বিন খাওয়ালী অবতরণ করেছিলেন।

(আসসুনানুল কুবরা, লিল বাইহাকি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৪, হাদীস: ৭১৪৩, জমা আবওয়াবুত তাকবীর আলা জানায়েয)

হযরত শুকরান এ সম্পর্কে বলেন, খোদার কসম, আমিই কবরে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহের নিচে মখমলের চাদর পেতেছিলাম।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুল জানায়েয)

মুসলিম শরীফের রেওয়াত অনুসারে তা লাল বর্ণের মখমলের চাদর ছিল। (সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয) এটি সেই চাদর ছিল যা রসূলে করীম (সা.) ব্যবহার করতেন। হযরত শুকরান বলেন, আমি পছন্দ করি নি যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর পর অন্য কোন ব্যক্তি এই চাদর গায়ে দিক। কেননা তিনি (সা.) এই চাদর গায়েও দিতেন আবার বিছাতেনও।

(আল মিনহাজ বিশারহে সহী মুসলিম, রচয়িতা ইমামা নুবী, পৃষ্ঠা: ৭৪৯)

মুরইয়সির যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) হযরত শুকরানকে বন্দিদের এবং মুরাসিদের ক্যাম্প থেকে যে ধনসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ও গবাদি পশু ইত্যাদি হস্তগত হয়েছিল সেগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। (আমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৬) তিনি খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এই কারণে তাকে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হতো। তাঁর সম্পর্কে উল্লিখিত রয়েছে যে, হযরত উমর হযরত শুকরানের পুত্র আব্দুর রহমান বিন শুকরানকে হযরত আবু মূসা আশআরীর কাছে পাঠান এবং লিখেন, আমি তোমার কাছে এক পুণ্যবান ব্যক্তি আব্দুর রহমান বিন সালেহ্ শুকরানকে পাঠাচ্ছি, যিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টিতে তার পিতার পদমর্যাদাকে সামনে রেখে তাঁর সাথে ব্যবহার করবে।

(আল আসাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১, আব্দুর রহমান বিন শুকারান)

এটি সেই মর্যাদা ছিল যা ইসলাম ক্রীতদাসদের দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু দাসত্বের শৃঙ্খল থেকেই মুক্ত করে নি বরং তাদের সন্তানসন্ততিও সম্মানিত গণ্য হয়েছেন। আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত শুকরান মদীনায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। বসরাতেও তার একটি বাসা ছিল। হযরত উমরের খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

(আল আসাবা, ৩ড খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৫, শুকারান) (আমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৬, ফাযলু ফি মাওলা রসূলুল্লাহ, ১৯৯৬ সালে বেরুতে প্রকাশিত)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত মালিক বিন দোহশমের। তাঁর সম্পর্ক খাজরাজের বনু গানাম বিন আউফ গোত্রের সাথে ছিল। তাঁর এক কন্যা ছিল, যার নাম ছিল ফারিয়া।

(আততাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮২, মালিক বিন আদদুহশম, ১৯৯৬ সালে বেরুতে প্রকাশিত)

আলেমদের এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, মালেক বিন দোহশম উকবার বয়আতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিনা। ইবনে ইসহাক এবং মূসা বিন উকবার মতে তিনি বয়আতে উকবায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক আলেমদের বিতর্ক চলতেই থাকে। হযরত মালেক বিন দোহশম বদর, ওহুদ, খন্দক বা পরিখা এবং এরপরের সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী এবং বাহনসঙ্গী ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৫-৪০৬,মালিক বিন আদদুহশম, ১৯৯৬ সালে বেরুতে প্রকাশিত)

সোহায়েল বিন আমর কুরাইশের বড় এবং সম্মানিত দলপতিদের একজন ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে মুশরেকদের পক্ষ থেকে যোগদান করেন, তাকে মালেক বিন দোহশম বন্দী করেন।

ঘটনা অনুসারে আমের বিন সাদ তার পিতা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াকাসের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি বদরের যুদ্ধের দিন সোহায়েল বিন আমরের প্রতি তির নিক্ষেপ করি যাতে তার শিরা কেটে যায়। এরপর আমি প্রবাহিত রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হতে থাকি। আমি দেখলাম হযরত মালেক বিন দোহশম তার কপালের চুল ধরে রেখেছেন। আমি বললাম, সে আমার বন্দী, আমি তাকে তির মেরেছি। কিন্তু হযরত মালেক বলেন, সে আমার বন্দী, আমি তাকে ধরেছি। পরে তাদের উভয়ে সোহায়েলকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) সোহায়েলকে তাদের উভয়ের হাত থেকে নিয়ে নেন আর রৌহা নামক স্থানে সোহায়েল হযরত মালেক বিন দোহশমের হাত থেকে পালিয়ে যায়। হযরত মালেক উচ্চস্বরে মানুষকে ডাকেন এবং তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) তখন বলেন, যে-ই তাকে পায় তাকে যেন হত্যা করে। যুদ্ধের জন্য এসেছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এরপর ধরা পড়ে আর সেখান থেকে পালিয়ে যায়, পুনরায় মুসলমানদের ক্ষতি করার আশঙ্কা ছিল, যেহেতু সে যুদ্ধবন্দী ছিল সেকারণেই এ নির্দেশ জারী করা হয়। যাহোক তার প্রাণ বাঁচার ছিল, তাই অন্য কারো হাতে পাকড়াও হওয়ার পরিবর্তে সোহায়েল বিন আমর মহানবী (সা.) এর হাতেই ধরা পড়ে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে পেয়ে হত্যা করেন নি, অন্য কোন সাহাবীর হাতে ধরা পড়লে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু যেহেতু মহানবী (সা.) এর হাতে ধরা পড়েছে তাই তিনি (সা.) তাকে হত্যা করেন নি। ”

এই হলো আদর্শ আর এই আদর্শ সেসকল সীমালঙ্ঘনকারীদের কথার উত্তর যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি দোষারোপ করে যে, তিনি নাকি অন্যায় করেছেন, হত্যা এবং খুনাখুনি করেছেন। অথচ যে শাস্তি যোগ্য ছিল আর যার শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তও হয়ে গিয়েছিল, সেই ব্যক্তিও যখন তাঁর কাছে ধরা পড়ে, তাকেও তিনি (সা.) হত্যা করেন নি।) একটি বর্ণনা অনুসারে সোহায়েলকে মহানবী (সা.) পেয়েছেন বাবলা গাছের ঝোপের ভিতর। তিনি (সা.) তাকে ধরে ফেলার নির্দেশ দেন। এরপর তার হাত তার ঘাড়ের সাথে বেধে দেওয়া হয় অর্থাৎ তাকে বন্দী করা হয়।”

(তারিখে দামস্ক, লি আসাকর, খণ্ড-১২, ভাগ-২৪, পৃষ্ঠা: ৩৩৩, সোহায়েল বিন আমর বিন আব্দ শামস , ১৯৯৬ সালে বেরুতে প্রকাশিত)

বুখারী শরীফে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত ইতবান বিন মালেক, যিনি মহানবী (সা.)-এর সেসব আনসারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে, আমি আমার জাতিকে নামায পড়াই। যখন বৃষ্টি হয় তখন আমার এবং তাদের বসতির মাঝে পানি জমে যায়, যার ফলে তাদের মসজিদে এসে আমি নামায পড়াতে পারি না। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার বাসনা হলো, আপনি আমার বাড়িতে আসুন আর আমার ঘরে নামায পড়ুন, তাহলে আমি সেটিকে মসজিদ হিসেবে অবলম্বন করব। মহানবী (সা.) বলেন, ইনশাআল্লাহ, আমি আসব। তিনি বলতেন যে, রসূলে করীম (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) প্রভাতে সূর্য উদিত হওয়ার পর একদিন আমার ঘরে আসেন। তিনি (সা.) অনুমতি চান, আমি অনুমতি দিই। তিনি (সা.) যখন ঘরে প্রবেশ করে বসেন নি বরং বলেন যে, ঘরের কোন জায়গায় চাও যে, আমি নামায পড়ি? তিনি বলেন, আমি ঘরের একটি কোণার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে দেখিয়ে দিই যে, আমি চাই আপনি এখানে নামায পড়ুন। মহানবী (সা.) নামাযের জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে যান আর নামায পড়েন এবং আল্লাহ্‌হু আকবার বলেন। আমরাও সেখানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। তিনি (সা.) দুই রাকাত নামায পড়েন, এরপর সালাম ফেরান। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমরা খাজিরা (মাংস আর আটা দ্বারা প্রস্তুতকৃত একপ্রকার খাবার) তাঁর (সা.) সামনে উপস্থাপনের জন্য তাঁকে বসতে বলি, যা তাঁর জন্য আমরা প্রস্তুত করেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন যে, ঘরে পাড়ার কিছু মানুষও জড় হয়, তারা সবাই যখন সমবেত হয় তাদের মধ্য থেকে কোন একজন বলেন যে, মালেক বিন দোহশম কোথায়? এতে তাদের মধ্য থেকেই কেউ বলেন যে, সে তো মুনাফেক, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসে না। সেই এলাকাতেই যেহেতু তিনি থাকতেন তাই তাঁর না আসাতে হয়ত কেউ এমন মন্তব্য করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, ‘এমনটি বলো না, তোমরা কি দেখ না সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়েছে, এর মাধ্যমে সে খোদা তা’লার সন্তুষ্টি সন্ধান করে।’ এতে সেই ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। এরপর সেই ব্যক্তি বলেন, আমরা তাঁর মনোযোগ এবং তার হিতাকাঙ্খা মুনাফেকদের জন্যই দেখেছি। হয়ত হৃদয়ের কোমলতার কারণে তিনি মুনাফেকদের তবলীগ করতে চাইতেন আর তাদেরকে ইসলামের দিকে টেনে আনতে চান, তাই তাদের প্রতি সহানুভূতিও রাখতেন। এই কারণে হয়ত সাহাবীদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা’লা অবশ্যই সে ব্যক্তির জন্য অগ্নিকে হারাম করে দিয়েছেন যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র ঘোষণা দেয়। কিন্তু শর্ত হলো এ ঘোষণার মাধ্যমে সে যেন খোদার সন্তুষ্টি কামনা করে। ”

(সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাব মাসাজিদু ফিল বুয়ুতে, হাদীস-৪২৫)

এটি সেই সব নামধারী আলেমদের খণ্ডন যারা কুফরি ফতোয়া প্রদান করে থাকে আর বিশেষ করে এ প্রেক্ষাপটে যারা আহমদীদের ওপর জুলুম এবং অত্যাচার করে। এই নামধারী আলেমদের ফতোয়াই মুসলমান দেশগুলোর শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করেছে। পাকিস্তানে আজকাল 'লাব্বায়েক ইয়া রাসূলুল্লাহ্' নামে একটি সংগঠনের সূচনা হয়েছে। তারা নারা উত্তোলন করে 'লাব্বায়েক ইয়া রসূলুল্লাহ্' আর রসূলুল্লাহ্‌র উক্তি হলো যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে তাকেও তুমি এটি বলবে না যে, তুমি মুসলমান নও। কেউ যদি খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এমনটি বলে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য অগ্নি হারাম করে দিয়েছেন। আর এরা বলে যে, না, তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা করছো না। এরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকেও বেশি মনের অবস্থা জানে। আল্লাহ্ তা'লা এদের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করুন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত এতবান বিন মালেক মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হযরত মালেক বিন দোহশাম হলো মুনাফেক। মহানবী (সা.) বলেন যে, সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা'র সাক্ষ্য দেয় না? এতবান উত্তরে বলেন, কেন নয়, কিন্তু এর কোন সাক্ষী নেই। এতে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কি নামায পড়ে না? তিনি বলেন, কেন নয় কিন্তু 'লা সালাতা লাহু' অর্থাৎ তার নামায কোন নামায নয়। (হয়তো তাদের কতকের মাঝেও আজকালকার মৌলভীদের মত কিছু কঠোরতা ছিল।) মহানবী (সা.) বলেন, এমন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিজের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে নিষেধ করেছেন।"

(আসাদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩০, মালিক বিন দোহশম, ২০০৩ সালে বেরুতে প্রকাশিত) একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই অন্তর্যামী।

মহানবী (সা.) কে তো আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন, কিন্তু এইসব আলেমদের কথা অনুসারে এদের কাছে এ লাইসেন্স বা সনদ রয়েছে, আল্লাহ্‌র নামে যথেচ্ছ জুলুম এবং অত্যাচার তারা করতে পারে, বিশেষ করে পাকিস্তানী আলেমরা।

হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সামনে হযরত মালেক বিন দোহশাম সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলায় মহানবী (সা.) বলেন, 'লা তাসুব্বু আসহাবী' অর্থাৎ তোমরা আমার সাথিদেরকে গালমন্দ করবে না।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৬, মালিক বিন আদদুহশম, ২০০২ সালে বেরুতে প্রকাশিত)

মহানবী (সা.) তবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় মদীনার অনতি দূরে যু-আওয়ান নামক স্থানে অবস্থান করেন। তখন মসজিদে 'যিরার' সম্পর্কে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়। তিনি হযরত মালেক বিন দোহশাম এবং হযরত মা'ন বিন আদী'-কে ডেকে পাঠান আর মসজিদে যিরারের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত মালেক বিন দোহশাম এবং হযরত মা'ন বিন আদী দ্রুত বনু সালেম গোত্রে পৌঁছান, সেটি হযরত মালেক বিন দোহশামের গোত্র ছিল। হযরত মালেক বিন দোহশাম হযরত মা'নকে বলেন যে, আমায় কিছুটা সময় দিন, আমি ঘর থেকে আগুন নিয়ে আসি। তিনি ঘর থেকে খেজুরের শুষ্ক ডালে আগুন লাগিয়ে নিয়ে আসেন, এরপর তারা উভয়েই মসজিদে যিরারে যান। এক বর্ণনা অনুসারে মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে তাঁরা সেখানে পৌঁছান আর সেখানে গিয়ে আগুন লাগিয়ে সেটিকে ধূলিসাৎ করেন। "

(শারাহ যিরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৭-৯৮, বাব গাযওয়ায়ে তাবুক, ১৯৯৬ সালে বেরুতে প্রকাশিত)

অতএব কিছু ভুল বুঝাবুঝির কারণে আমরা এমন সাহাবীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করতে পারি না। সেই সব সাহাবীর ধারণা ছিল যে, মালিক বিন দোহশাম হয়তো ভুল পথে এগিয়েছেন, এমনকি কেউ কেউ তাকে মুনাফেকও আখ্যা দেয়; কিন্তু ইনিই পরবর্তীতে খোদার নির্দেশে মুনাফেকদের কেন্দ্রকে ধ্বংস করেন।

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও এই আত্মজিজ্ঞাসা করার তৌফিক দান করুন যে, খোদার আদেশ নিষেধ কী আর আমরা কতটা তা বাস্তবায়ন করছি। (আমীন)

****

প্রথম পাতার পর...

(আ.) এর আগমনকালীন ইহুদীদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ।

আল্লাহতালা যাহা চাহেন তাহাই করিয়া থাকেন। মূর্খ সেই ব্যক্তি যে খোদাতালার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সে জাহেল, যে তাঁহার মোকাবেলায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, এমন নহে বরং এইরূপ হওয়া উচিত ছিল।

আল্লাহতালা আমাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন যাহা সংখ্যায় দশ হাজারেরও বেশী হইবে। ইহাদের মধ্যে 'প্লেগ'ও একটি নিদর্শন। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়াত গ্রহণ করিয়া সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হইয়া স্বীয় কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করে সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করিবে। সুতরাং হে লোক সকল! যাহারা নিজেকে আমার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামাতভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্ওয়ার (খোদা-ভীরুতার) পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করিবে যেন তোমরা আল্লাহতালাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। যাহারা যাকাত দিবার উপযুক্ত তাহারা যাকাত দিবে। যাহাদের জন্য হজ্জ্ ফরয হইয়াছে এবং তাহা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে তাহারা হজ্জ্ করিবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে এবং পাপকে ঘৃণার সহিত বর্জন করিবে, নিশ্চয় স্মরণ রাখিও যে, কোন কর্ম আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যাহাতে তাক্ওয়া নাই। প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্ওয়া। যেই কর্মে এই মূল ধ্বংস হয় না, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হইবে না। ইহা নিশ্চত যে, তোমাদিগকে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে যেরূপ পূর্ববর্তী মোমেনগণের পরীক্ষা হইয়াছিল। অতএব সাবধান! এইরূপ যেন না হয় যে, তোমরা হোঁচট খাও। দুনিয়া তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না যদি আকাশের সহিত তোমদের সম্পর্ক থাকে। তোমাদের নিজেদের ক্ষতি নিজেদের হাতেই হইবে, শত্রুর হাতে নয়। তোমাদের পার্থিব সম্মান যদি বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে খোদা তোমাদিগকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করিবেন। অতএব তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। অবশ্য তোমাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইবে এবং অনেক আশা হইতে তোমাদিগকে নিরাশ করা হইবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমরা দুঃখিত হইও না কেন তোমাদের খোদা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান যে, তোমরা তাঁহার পথে অবিচল রহিয়াছ কি-না। যদি তোমরা চাহ যে, আকাশে ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তাহা হইলে মার খাইয়াও তোমরা সন্তুষ্ট থাকিবে, গালি শুনিয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না। তোমরা আল্লাহতালরার শেষ জামাত। সুতরাং তোমরা সেই নেক আমল প্রদর্শন কর যাহার উৎকর্ষতা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ অলস হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত জামাত হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার মৃত্যু ঘটিবে। সে আল্লাহতালার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। দেখ, আমি অতি আনন্দের সহিত তোমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছি যে, বাস্তবিকই তোমাদের খোদা মওজুদ আছেন। যদিও সকলে তাঁহারই সৃষ্ট, তবুও তিনি সেই ব্যক্তিকেই মনোনীত করিয়া থাকেন, যে তাঁহাকে মনোনীত করে। যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, তিনি তাহার নিকট যান। যে তাঁহাকে সম্মান দেয়, তিনিও তাহাকে সম্মান দান করেন।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৩-১৫)

---

*টীকা: *ইহুদীগণ তাহাদের ইতিহাস অনুযায়ী সর্বসম্মতভাবে ইহাই বিশ্বাস করে যে, মূসা (আ.) এর পরবর্তী চৌদ্দশত শতাব্দীর শিরোভাগে ঈসা (আ.) এর আবির্ভাব হইয়াছিল। (ইহুদীদের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)*

ইমামের বাণী

এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। (ফতেহ ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩১)

ইসলামে পরধর্মসহিষ্ণুতা

মূল: হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানি:

অনুবাদ: মোরতোজা আলি (বড়িশা)

রসূলে করীম (সা.) অন্যান্য জাতির সৎপ্রকৃতির মানুষের সঙ্গে কার্যক্ষেতে সম্মানজনক ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যখন 'ত্বায়' গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল, তখন কিছু 'মুশরিক' (মূর্তি উপাসক) বন্দী হিসাবে গ্রেফতার হয়েছিল। তার মধ্যে হাতেমতাই -এর কন্যাও ছিল। তিনি রসুল করীম (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে বললেন, আপনি জানেন আমি কার কন্যা? রসুল করীম (সা.) বললেন, 'তুমি তো হাতেম তাই-এর কন্যা। সে বলল আমি সেই ব্যক্তির কন্যা যিনি বিপদের সময় মানুষের সাহায্য করতেন অর্থাৎ হাতেম তাই। তিনি মুসলমান ছিলেন না। কিন্তু লোকের সাথে সুব্যবহার করতেন। এইজন্য রসুল করীম (সা.) তার কন্যাকে মুক্ত করে দিলেন। তার ভাই গ্রেপতার হওয়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। রসূল করীম (সা.) তৎক্ষনাৎ তাকে টাকা পয়সা ও যানবাহন দিয়ে বললেন, যাও নিজের ভাইকে নিয়ে এস। অতএব সে চলে গেল ও তাকে নিয়ে এল। এই ব্যবহার তার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যাতে সে মুসলমান হয়ে গেল। এইরূপে রসুলে করীম (সা.) তার সুপারিশে সমস্ত জাতিকে ক্ষমা করে দিলেন।

(সিরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৭)

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূল করীম (সা.) কার্যক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণকে শুধু স্বীকৃতি দেন নি বরং তাদের সাথে সমস্ত লোকদের প্রতিও সৎ-ব্যবহার ও উপকার করেছেন। অতএব এরই ফলশ্রুতিতে হযরত আবু বাকার (রা.) এর সময়কালে 'ত্বায়' গোত্রের কিছু লোক সামান্য কয়েকজনের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বিদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখন হাতেমতাইয়ের ছেলে ইসলাম থেকে সরে গিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে এসে নিজের জাতিকে বুঝিয়ে পুনরায় তাদেরকে বয়াত করালেন।

নাজরানের খৃষ্টানদের ঘটনা

নাজরানের এক খৃষ্টান প্রতিনিধিদল রসুল করীম (সা.) -এর কাছে যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্বের সমর্থনে আলোচনা করতে এসেছিল। যখন তাদের উপাসনার সময় হল তখন রসুল করীম (সা.) তাদের নিজ রীতি অনুসারে মসজিদ নববীতে উপাসনা করার অনুমতি প্রদান করলেন। আর তারা সবার সামনে পুর্বদিকে মুখ করে উপাসনা সম্পন্ন করলেন।

(যা'দুল ম'য়াদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫ ও সিরাত ইবনে হিশাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৯)

এই ব্যবহার দেখে কেউ বলতে পারে মানুষের প্রাণ নাশ ও অত্যাচার করার জন্য রসূল করীম (সা.) আগমণ করেছিলেন। যে প্রাণ-নাশ করে, সে কি নিজের চোখের সামনে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে উপাসনা করার অনুমতি প্রদান করতে পারেন। তাও কিনা সেই মসজিদে যার সম্বন্ধে তিনি (সা.) 'আখেরুল মসজিদ' বলেন। অন্য মসজিদের তুলনায় যেখানে নামায পড়া অধিক পুণ্য বলে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই মসজিদে খোদা তা'লার নবী (সা.) এর উপস্থিতিতে খোদা তা'লার তৌহিদ (একাত্ববাদ) প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে কর-কোন অসুবিধা নেই। আজকাল পরধর্মসহিষ্ণুতার বড় বড় দাবীকারদের অন্য ধর্মাবলম্বী লোকদিগের উপাসনা করতে দেওয়ার সৎসাহস নেই। আহমদীয়া মুসলিম জামাতেই একমাত্র এই দৃষ্টান্ত আছে যারা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। লন্ডন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কালে এই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ' এই মসজিদ একমাত্র খোদা তা'লার উপাসনা করার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে যার দ্বারা পৃথিবীতে খোদার প্রতি ভালবাসা স্থাপন হয় এবং মনুষ্যজাতি ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয়, যা ছাড়া প্রকৃত শান্তি ও উন্নতি সম্ভব নয়। আমরা এখন কোন ব্যক্তিকে যে শর্তসাপেক্ষে ঐ সমস্ত বিধি নিয়ম পালন করা যা যা কর্তৃপক্ষ অবধারিত করেছেন, শর্তসাপেক্ষে ঐ সকল লোকেরা ইবাদত করতে দিতে বাধ্য আর তারা যেন কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, যা নিজ ধর্মের আবশ্যকতা পূরণ করার জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।" (আল ফযল, ২০ শে নভেম্বর, ১৯২৪) আমার স্বরণ আছে একবার আমাদের বিরুদ্ধে কাদিয়ানে আর্য ধর্মাবলম্বীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারা ভীষণ হৈ চৈ করে, সভার পর তাদের বক্তা আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। আমি তাকে বললাম শুনেছি স্থানাভাবে আপনাদের অসুবিধা হয়েছে। আপনি আমার কাছে এলে আমি আমাদের মসজিদেই ব্যবস্থা করে দিতাম। তিনি বললেন, আপনি কি আপনাদের মসজিদে অনুমতি দিতেন? আমি বললাম, কেন নয়। রসূল করীম (সা.) খৃষ্টানদের নিজ রীতি অনুযায়ী ইবাদত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাহলে আমি কেন আপনাদের অনুমতি দিতে পারতাম না? ইত্যবসরে তাদের মধ্য থেকে একদল বলল, যদি আপনি অনুমদি দেন, তাহলে আমি এখনই বক্তৃতা দিতে পারি। আমি বললাম, অনুমতি দিলাম। অতএব মসজিদ আকসাতে তার বক্তৃতা হল, যেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর আর্যসমাজীদের উপস্থিতিতে হাফেয রওশন আলি সাহেব (রা.) তাদের আপত্তিকর বিষয়গুলির উত্তর প্রদান করেন। সম্ভবতঃ বারো তেরো বৎপর পর তাদের দ্বিতীয় সভা হয়। মোট কথা ইসলাম অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতার শিক্ষার ধারক-বাহক। তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন ধর্ম উপস্থাপন করতে পারে না।

অন্যান্য ধর্মের প্রতি রসুল করীম (সা.) এর ব্যবহারের তৃতীয় উদাহরণ-তিনি (সা.) নিজ প্রতিবেশীদের সঙ্গে যে কোন ধর্ম ও জাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন। এই সম্বন্ধে এত জোরালো ভাবে বলতেন যা সাহাবাগণ (রা.) সর্বদা পালন করার জন্য যত্নবান হতেন। লিখিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একবার বাড়িতে এসে দেখলেন কোন এক জায়গা থেকে মাংস এসেছে। তিনি বাড়ির লোকজনদের জিজ্ঞাসা করলেন, ইহুদী প্রতিবেশীকে মাংস পাঠানো হয়েছে কি না? আর তিনি এই কথা বারবার উচ্চারণ করলেন। বাড়ির লোকেরা বললেন, আপনি এইভাবে কেন বলছেন? তিনি বললেন, আমি রসুলে করীম (সা.) এর নিকট শুনেছি যে জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীদের 'হক' (অধিকার) দেওয়ার ব্যাপারে এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমি মনে করি হয়তো এটা উত্তরাধিকারের অংশ করে দেওয়া হবে।

রসূলে করীম (সা.) এর এই প্রকার কার্যকরী ব্যবহার ছিল যা (সা.) অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন ছিল। তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুভুতি সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখতেন। একবার হযরত আবুবকর (রা.) এর সামনে কোন এক ইহুদী বললেন, আমি মূসা (আ.) এর কসম খেয়ে বলছি তাকে সমস্ত নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এইজন্য হযরত আব বাকার (রা.) তাকে চপাটাঘাত করলেন। যখন এই ঘটনার সংবাদ রসুল করীম (সা.) এর নিকট পৌঁছাল, তখন তিনি (সা.) হযরত আবুবাকর (রা.)এর মত মানুষকে ধমক দিলেন। চিন্তা কর মুসলমান রাষ্ট্র। রসুল করীম (সা.) এর উপর হযরত মূসা (আা.)কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে এবং এমন ভঙ্গিতে কথা বলেছে যা হযরত আবু বাকারের ন্যায় কোমল চিত্তের মানুষকে ক্রোধান্বিত করেছে এবং তিনি তাকে চপেটাঘাত করেছেন। কিন্তু রসুলে করীম (সা.) তাকে তিরস্কার করে বললেন, তুমি কেন এমন কাজ করেছ? তার অধিকার আছে যা ইচ্ছা বিশ্বাস পোষণ করুক।

তাঁর (সা.) ভাল ব্যবহারের চতুর্থ উদাহরণ: খায়বর বিজয়ের প্রাক্কালে এক ইহুদী তাঁকে (সা.) নিমন্ত্রণ করে মাংসের সাথে বিষ মিশিয়ে দিলেন। তিনি মাত্র একটু খানি খেয়েছিলেন। তখনই তাঁর (সা.) উপর ঐশীবাণী অবতীর্ণ হল, এর মধ্যে বিষ আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি খাওয়া বন্ধ করে

দিলেন। তারপর তিনি (সা.) সেই স্ত্রী লোককে ডেকে বললেন এই খাবারে তো বিষ আছে। সে বলল, আপনাকে কে বলেছে? তাঁর (সা.) হাতে সেই সময় মাংস ছিল। তিনি ঐ দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ হাতই আমাকে বলেছে। ইহুদী স্ত্রীলোকটি বলল, আমি বিষ এই জন্য মিশিয়েছিলাম যদি আপনি সত্যি সত্যি খোদা তা'লার নবী হন তাহলে আপনি এই বিষয় জানতে পারবেন। আর যদি মিথ্যে হয় দুনিয়াবাসী আপনার সত্তা থেকে মুক্তির লাভ করবে। যদিও তাঁকে (সা.) বিষ দ্বারা হত্যার প্রচেষ্টা এবং একজন সাহাবী (রা.) কে এই বিষ দেওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাকে কোন শাস্তি দেন নি। এটা কত বড় ভাল ব্যবহার যা তিনি ঐ স্ত্রীলোকের সাথে করেছিলেন। যে কিনা তাঁকে ও তাঁর সাহাবাকে প্রাণ নাশের চেষ্টা এবং ইসলামের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিল।

রসুলে করীম (সা.) এ সুব্যবহারের পঞ্চম উদাহরণ: যখন তিনি (সা.) যুদ্ধ-যাত্রায় যেতেন তখন সৈন্যদিগকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন, কোন জাতির উপাসনা গৃহকে ধ্বংস কোরো না। তাদের ধর্মগুরুকে হত্যা করো না, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুদের উপর আক্রমণ করো না। রসুল করীম (সা.) এর যুগের পূর্বে পাদ্রী ও সন্ন্যাসীদের হত্যা করা প্রচলিত ছিল। কিন্তু রসুলে করীম (সা.) এটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করেছিলেন। যদি তিনি অন্যান্য ধর্মের ন্যায় শত্রুভাবাপন্ন হতেন, যেমন বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁকে আরোপ করে থাকেন, তবে কি তিনি এই নির্দেশ দিতেন যে ঐ ধর্মের পথ প্রদর্শকদের মুক্তি দেওয়া হোক। তিনি তো বলতে পারতেন তাদের মারা হোক। কিন্তু তিনি বলেন নি, যদি কেউ তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে তাকে অব্যশই মার। কিন্তু যারা ধর্মীয় কাজে রত তাদেরকে কিছু বলো না।

পৃথিবীর এটাই রীতি যখন কারো সাথে যুদ্ধ হয় তখন তার আবেগ-অনুভুতির প্রতি কেউ চিন্তা করে না। পরাজিত জাতিকে সর্বপ্রকার নিষ্পেষণ ও তাদের আবেগ-অনুভুতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রসুলে করীম (সা.) এর মাহাত্ম্য দেখ! মক্কাবাসীরা কত নিদারুন অত্যাচার করেছিল। দীর্ঘ তের বৎসর মক্কাবাসীর অবিরত তাঁকে ও তাঁর সহচরদের উপর অত্যাচর করতে থাকে। স্ত্রীলোকদের শরীরের গুপ্তস্থানে বর্শা মেরে হত্যা করা হয়েছে। সাহাবাদের দড়ি বেঁধে গরম বালিতে টান-হেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়া হত। চুল্লি থেকে কয়লা বার করে তার উপর মুসলমানদের শোয়ানো হত। কিছু সংখ্যা পুরুষ ও মহিলাদের চোখ বের করে নেওয়া হয়েছিল এবং এমন কি অত্যাচারিত হয়ে অবশেষে রসুলে করীম (সা.) নিজ জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যখন তিনি (সা.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে গেলেন, সেখানেও তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। সেখানকার লোকেরা তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছিল। রোম ও ইরান সম্রাটের শাসকদের প্ররোচিত করা হয়েছিল। কিন্তু যখন ঐ জাতির বিরুদ্ধে তিনি (সা.) দশ হাজার সৈন্যদল নিয়ে মক্কা অভিমুখে অভিযান করে নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছালেন তখন সৈন্যদলের একাংশের এক কমান্ডারের মুখ থেকে এই কথা বেরিয়ে পড়ে যে, আজ মক্কাবাসীদের দেখে নেব। আজ আমরা তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিব। এই জন্য আবুসুফিয়ান অগ্রসর হয়ে অভিযোগ করলেন, ঐ ব্যক্তি আমার অন্তরে ব্যাথা দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ রসুল করীম (সা.) সেই ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, তোমাকে পদচ্যুত করা হচ্ছে। কেননা, তুমি মক্কার কাফেরদের আবেগ-অনুভুতির কথা মনে রাখ নি। দেখ, এখন তো জানা নেই মক্কাবাসীরা কি আচরণ অবলম্বন করবে আর যুদ্ধের পরিণাম কি ঘটবে। কিন্তু মক্কা বাসীদের একজন দলপতির বলার দরুণ যিনি সারা জীবন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থেকেছে ও কাফের সৈন্যদলের কমান্ডর ছিল, তিনি একজন ইসলামী কমান্ডারকে পদচ্যুত করে দিলেন। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এই রকম কোন দৃষ্টান্ত কি উপস্থাপন করা যেতে পারে। কমান্ডার তো দূরের কথা এমনকি নায়েব বা নিম্নপদস্থ কাহাকেও কি কখনও এজন্য সাজা দেওয়া হয়েছে যে কি না যুদ্ধের মাঠে দাঁড়িয়ে বলেছে আজ আমরা শত্রুদের দেখে নিব। আর কৃতকর্মের স্বাদগ্রহণ করাব। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এক বিখ্যাত ব্যক্তি আব্রাহাম লিঙ্কনের উল্লেখ আছে। তার সময় দুই দলে মদ্যে বিবাধ বাধল। একদল বলল, কৃতদাস প্রথা স্থায়ী থাকা উচিত। অপর দলকে অত্যাচারী প্রতিপন্ন করে বিলোপ করতে চাইল। আব্রাহাম লিঙ্কন বিলোপ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ওর সৌন্দর্য এইভাবে বর্ণনা করা হয়, যখন অপর পক্ষ হেরে গেল আর তিনি জয়লাভ করলেন। তখন তিনি মাথা নীচু করে বিরুদ্ধ পক্ষের এক জার্নেলের বাড়ি গেলেন। কথিত আছে যে সে সময় তিনি দোয়া করছিলেন। অফিসারেরা তাকে বললেন, আমাদের ব্যান্ড বাজিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তিনি বললেন, না। এইরূপে অপরের মনে আঘাত লাগবে। এটা একটা আব্রাহাম লিঙ্কনের বিশেষ গুণ বর্ণনা করা হয়। তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে কষ্ট দেন নি। কিন্তু রসুল করীম (সা.) যখন মক্কায় আক্রমণোদ্যগী হলেন, তখন তিনি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন, যারা প্রায় এক চতুর্থাংশ শতাব্দী শতাব্দী মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছিল। যারা তাকে ও তার সহচরদের মক্কা বাসের ১৩ বৎসর যাবৎ অবিরত মারধর ও হত্যার চেষ্টা করেছিল এবং তারপর সাত বৎসর পর্যন্ত দুশো মাইল মাইল দূরে গিয়েও তাকে বিনাশ করার চেষ্টা করত। এই সমস্ত অত্যাচর করা সত্ত্বেও যখন তিনি (সা.) মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তিনি (সা.) ক্ষমা ও উদারতার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন যা আব্রাহাম লিঙ্কনের দৃষ্টান্ত ম্লান হয়ে যায়। তিনি মক্কাবাসীদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল, এখন তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। যদি সেই সময় তাদের দেহগুলিকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করে দেওয়া হত, তবে আমার মনে হয়, তাদের অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশি হত না। কিন্তু যখন তারা বলল, আমাদের সাথে ঐরূপ ব্যবহার করা হোক যা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের সাথে করেছিলেন। তখন তিনি (সা.) বললেন, ' লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইওয়াম'।

যাও তোমাদের মাফ করা হল ও তিরস্কর ভর্ৎসনাও নয়। এটা ঐ পরিসমাপ্তি যা ঐ বিরাট যুদ্ধে হয়েছিল। যা তাঁর (সা.) ও বিরোধীদের মাঝে বিশ বছর অব্যাহত ছিল। এই দৃষ্টান্তের পর কোন ব্যক্তি বলতে পারে মহম্মদ (সা.) অ-মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও তরবারীর জোরে নিজ ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মীয় সংস্কার বা অজ্ঞতাবশতঃ আপত্তি করা অন্য কথা। তবে যে ব্যক্তি বস্তবাদিতার উপর চিন্তাভাবনা করতে অভ্যস্ত সে এটা স্বীকার করতে পারে না যে, মোহাম্মদ (সা.) এর চেয়ে বেশি শত্রুদের সাথে সৎ-ব্যবহারকারী আর কোন ব্যক্তি দেখা যায় নি। কোন সন্দেহ নেই হযরত ইউসুফ (আ.) ও নিজ ভাইদিগকে 'লা তাসরিবা আলইকুমুল ইয়াম বলেছিলেন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) এর সম্মুখে তাঁর ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। যাদের সুপারিশকারী তাদের পিতা-মাতা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত লোক যারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) সামনে উপস্থিত হয়েছিল, তারা তাঁর প্রিয়জন ও ভাইদের হত্যাকারী ছিল। হযরত হামযা (রা.)র হত্যাকারী কারা ছিল? হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর কারণ কোন ব্যক্তিরা ছিল? রসুলে করীম (সা.)-এর স্নেহের কন্যাকে কারা মেরেছিল, যখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন? আর তাঁর স্বামী এই চিন্তা করে যে, ইসলামের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করার কারণে লোকেরা তাদের উত্যক্ত করত। সেই জন্য মদিনায় রওয়ানা করে দিলেন। কিন্তু কাফেররা তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিল, যদ্বারা গর্ভপাত হয়ে গেল। এরই কারণে পরবর্তীতে তার মৃত্যু হল। হযরত ইউসুফ (আ.) এর সম্মুখে কি ভাবাবেগ ছিল? শুধু এটাই যে, তার ভাইয়েরা তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু এখানে অবস্থা তো এমন ছিল আবু তালেবের আত্মা আঁ হযরত (সা.) কে সম্বোধন করে বলেছিল, এরা আমার হত্যাকারী যারা তোমার জন্য বছরের পর বছর নিজ জাতির সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করেছে। কল্প-জগত থেকে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর (সা.) সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন

আমি নিজ ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের সব কিছু আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। এখন এইসব লোক আপনার সামনে দন্ডায়মান যারা আমার হত্যাকারী। হযরত হামযা (রা.) দাঁড়িয়ে বলছেন, এদের মধ্যে ঐ লোকও আছে যা আমার লাশ (মৃতদেহ) কে অবমাননা করেছে এবং আমার হৃৎপিন্ড ও যকৃত বের করে ফেলে দিয়েছিল। তাঁর (সা.) কন্যা সামনে দাঁড়িয়ে বলছিল, এরাই সেই লোক যারা নারীর উপর আঘাত হানতে লজ্জা পায় নি। এবং এমন অবস্থায় আমার উপর আক্রমণ করল যখন আমি গর্ভবতী ছিলাম। আমাকে এমনভাবে ক্ষতি করল যদ্বারা আমার মৃত্যু হল। তারপর সহস্র সহস্র সাহাবারা (রা.আনহুম) যারা আঁ হযরত (সা.) কে নিজ সন্তান সন্ততিদের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিলেন, যখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে কাফেরা বন্দী করে হত্যা করতে উদ্যত হল, তখন তারা জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি পছন্দ করবে না এই সময় তোমাদের জায়গায় মোহাম্মদ হোক। সে উত্তর দিল, আমি তো এও পছন্দ করি না আমি আমার ঘরে আরাম করে বসে থাকি আর মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর পায়ে মদিনায় হাঁটতে হাঁটতে কাঁটা ফুটে যায়। এইরূপ প্রিয় সাহাবা (রা.) কেও কষ্ট দিয়ে মারা হয়েছে। তাদের আত্মা ঐ সময় কল্পলোক থেকে আঁ হযরত (সা.) এর সম্মুখে বলছিল, এরাই আমাদের হত্যাকারী। এখন এদের প্রতি আমাদের প্রতিশোধ নেওয়া হোক। কিন্তু এই সমস্ত আবেগ অনুভুতি সত্ত্বেও আঁ হযরত (সা.) এই কথাই বললেন, 'লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইওয়াম।' যাও আজ তোমাদের উপর কোন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করা হবে না। এত বিরাট দৃষ্টান্ত দেখেও যদি কোন ব্যক্তি বলে ইসলাম শত্রুদের প্রতি পরধর্মসহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয় না, তবে এর চেয়ে অধিক অন্ধ আর কোন ব্যক্তি হতে পারে না।

ইসলামের পরধর্মসহিষ্ণুতার শিক্ষার এমন প্রভাব ছিল যে, ইসলামী দেশে রাষ্ট্রের অধীনে অন্যান্য জাতির লোকেরা বড় বড় উচ্চ পদস্থ চাকুরীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই , রসুলে করীম (সা.) এর যুগে ও তাঁর খোলাফাদের যুগে ইসলাম এক উৎকণ্ঠিত যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল এবং তখন এমন কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি যেখানে সমস্ত জাতি সম্মিলিত নিয়ন্ত্রিতভাবে স্থির করত। অতএব কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার পরিপূর্ণভাবে অ-মুসলমানদের দেওয়া যেতে পারত না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যেখানে সম্ভব ছিল তাদেরকে গোষ্ঠীপ্রধানের অধিকার দেওয়া হয়। এইরূপে রসুল করীম (সা.) মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে যে চিঠি লেখেন তাতে পরিস্কারভাবে লেখা আছে যে, 'তোমাদের গভর্নর তোমাদের জাতির মধ্য হতে হতে হবে অথবা রসুল করীম (সা.) এর বংশের মধ্য হতে হবে। (মজমুয়াতুল ওয়াসেকুল সিয়াসিয়া, পৃষ্ঠা: ৩৬) এতে রসুলে করীম (সা.) বলেন, কোন অঞ্চলের গভর্নর অমুসলিমও হতে পারে।

এইরূপে রসুলে করীম (সা.) এর খোলাফাদের যুগে যদিও তখন থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত জাতি সম্মিলিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় নি। কিন্তু তাদের অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এইরূপে আল্লামা শিবলী উল্লেখ করেছেন, 'হযরত ওমর (রা.) সৈন্য বিভাগ যেভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন, তাতে কোন দেশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল না। এমনকি ধর্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না। স্বেচ্ছা সৈনিকে হাজার হাজার অগ্নি উপাসকেরা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের বেতন মুসলমানদের সমান ছিল। সেনা ব্যবস্থাপনায় অগ্নি উপাসকদের খোঁজ পাওয়া যায়।" (আল ফারুক, দ্বিতীয় খণ্ড, সেনা ব্যবস্থাপনা শিরোনামে, পৃষ্ঠা: ১০৭)

তিনি আরও লিখেছেন, 'গ্রীক ও রোমীয় বীরেরা সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন মিশর বিজয়ের সময় পাঁচশ জন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমর বিন আস যখন ফিসতাতে বসতি স্থাপন করলেন, তখন এদের জন্যও পৃথকভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ইহুদিদের মধ্যেও এই ধারাবাহিকতায় শূন্যতা ছিল না। এইরূপে মিশর বিজয়ে এদের এক হাজার লোক ইসলামী সৈন্যদলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।" (আল ফারুক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৬) তফসীর কবীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫২৯-৫৩৪)

কাদিয়ানের টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান দারুস সানাতে ভর্তি, ২০১৮-১৯ সন

Ahmadiyya Vocational (Technical) Training Centre Qadian

প্রযুক্তিগত শিক্ষা ছাড়াও কাদিয়ানের পরিবেশে নামায ও দরস থেকে লাভবান হওয়ার দারুন সুযোগ

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যুবক শ্রেণীকে কর্মদক্ষ এবং কল্যাণকর নাগরিকে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালে কাদিয়ানের পবিত্রভূমিতে দারুস সানা'ত প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন যা দেশ বিভাজনের পর প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এখন আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে দারুস সানাত পুনরায় ২০১০ সালে প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর মঞ্জুরী ও নির্দেশক্রমে চালু হয়েছে যা বর্তমানে নাযারত তালিম কাদিয়ানের অধীনে সেবাদান করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের (NSIC) National Small industries Corporation এর সঙ্গে Affiliated। এই প্রতিষ্ঠান থেকে এক বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রদেরকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সনদ দেওয়া হয়।

সারা ভারতের আহমদী যুবকদের কাছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে। দারুস সানাতে বর্তমানে নিম্নোক্ত টেকনিক্যাল বিষয়ে এক বছরের কোর্সের মাধ্যমে পড়ানো এবং হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে। (১) ওয়েল্ডিং (২) ইলেকট্রিক্যাল (৩) প্লাম্বিং (৪) এ.সি ও ফ্রিজ (৫) ডিজেল মেকানিক (৬) পেট্রোল মেকানিক (৭) কার্পেন্টার এবং (৮) কম্পিউটার কোর্সে কয়েক শত আহমদী যুবক প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে কাজ করছে।

ভর্তির শর্তাবলী:

(১) প্রত্যাশীকে অষ্টম শ্রেণী পাস হতে হবে। (২) প্রবেশিকা ফর্ম সম্পূর্ণরূপে পুরণ করে ৩০ শে জুন, ২০১৮ তারিখের মধ্যে দারুস সানাত প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যালের কাছে রেজিস্ট্রি ডাক বা ই-মেলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে বা সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। (৩) কাদিয়ানের বাইরে থেকে আগত ছাত্রদেরকে জামাতের আমীর/ সদর/ মুবাল্লিগ-এর প্রত্যায়িত পত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। (৪) হোস্টেলের সুবিধা শুধুমাত্র ৪০ জন ছাত্রের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। এর থেকে বেশি ছাত্র হলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছাত্রকে নিজেকেই করতে হবে। (৫) সমস্ত কোর্স এক বছরের। অতএব যে টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তি হতে চায় তার ফি একত্রে কিম্বা দুটি কিস্তিতে পরিশোধ করা আবশ্যক। (৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান আসার নির্দেশ টেলিফোনে বা পত্রের মাধ্যমে দেওয়া হবে। অনুমতি পেলে ৩০ শে জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নিজের খরচে কাদিয়ানে পৌঁছে যান। (৭) প্রবেশিকা ফর্মের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিগুলি অবশ্যই যুক্ত করুন। (পার্সোনাল মেডিক্যাল ফাইলে রক্তের গ্রুপ এবং কোন এল্যার্জি থাকলে তার উল্লেখ, জামাতের পরিচয় পত্র, স্কুল সার্টিফিকেট জন্ম তারিখ সহ, আধার কার্ড/ ভোটার কার্ড এবং তিনটি ছবি থাকবে) বিস্তারিত বিবরণ টেলিফোনের মাধ্যমে জানা যেতে পারে।

প্রবেশিকা ফর্ম ই-মেলের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন।

ইমেল- darulsanaat.qadian@gmail.com

Mobile: 9872923363

(মুবাশ্বের আহমদ বাট, প্রিন্সিপাল, দারুস সানাত, কাদিয়ান।

اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ -

(কথা বলার পূর্বে সালাম করার রীতি অবলম্বন কর)

অর্থাৎ যখন কারোর সঙ্গে সাক্ষাত কর বা কোন মজলিসে প্রবেশ কর তখন সালাম কর। এর পর কিছু কথা বলার থাকলে তা বল।

ইমামের বাণী

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আঁ হযরত (সা.)-প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং ভালবাসা মানুষকে অবশেষে খোদা তা'লার প্রিয় বান্দায় পরিণত করে (হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

২৮ শে আগস্ট, ২০১৬ তারিখে জার্মানীর Pfungstadt শহরে জামাতে আহমদীয়ার মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাঊয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সমস্ত অতিথিবর্গ ও জামাতের সদস্যগণকে সালাম জানাই।

এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ যে জামাত আহমদীয়া জার্মানি দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করছে। এর ফলে ইবাদত করার স্থান পাওয়ার পাশাপাশি জামাতের পরিচিতও ঘটছে, এবং মানুষের মনে জামাত সম্পর্কে যে সব শঙ্কা রয়েছে সেগুলিও দূরীভুত হচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদ পরিচিতি বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জার্মানির আমীর সাহেব বলেন, এই শহর অভিবাসীদেরকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাদেরকে একীভুত করেছে। নবাগতরাও শহরের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজেদেরকে এই শহরের সঙ্গে সমন্বিত করেছে। উভয় পক্ষের মধ্যে এই একাত্মতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি শহরের স্থানীয় বাসিন্দারা নবাগতদের সঙ্গে একীভুত না হতে চায়, বরং তাদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চায় তবে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন এই দূরত্ব থেকেই যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি শহরের মানুষদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই কারণ বহিরাগতদেরকে এবং বিশেষ করে আহমদীদেরকে তারা নিজেদের সঙ্গে এক করে নিয়েছে। আর আহমদীদেরও এটিই আচরণ হওয়া উচিত যে, যখন স্থানীয় মানুষরা আমাদেরকে তাদের সঙ্গে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে একীভুত করে নিয়েছে, তখন আমাদেরও উচিত তাদের সাথে ভাল বন্ধুর মত সম্পর্ক রাখা। তাদের যাবতীয় প্রয়োজনে আমরা যেন উপকারে আসি।

আমীর সাহেব চ্যারিটির উল্লেখ করে বলেন, চ্যারিটির প্রচুর অর্থ এখানে দেওয়া হয়েছে। এটি এই শহরের মানুষদের উপর কোন অনুগ্রহ নয়। জামাত আহমদীয়ার কাজই হল মানবতার সেবা করা এবং মানুষের উপকারে আসা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর ফারসী পঙক্তিতে বলেন, আমার উদ্দেশ্যই হল মানবতার সেবা করা। এই কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত।

যে সকল বক্তা এখানে এসে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে গেলেন তাদের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই আমি এখানে কয়েকটি কথা বলব। আমীর সাহেবের কথার প্রসঙ্গটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি জানান যে এই শহর ১৮৮৬ সালে স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ৮০ -এর দশকেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম সেবার গুরু দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন এবং ইসলামকে রক্ষা করতে অজস্র পুস্তক রচনা করেন এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ১৮৮৯ সালে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব ১৮৮০ -এর দশক জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা কাল হওয়ার পাশাপাশি এই দশকে তিনি এও দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ তা'লা তাঁকে পৃথিবীবাসীকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে এবং ধর্মের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া কদাচার ও পাপাচার দূর করতে প্রেরণ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে এ কথাও বলন যে, " আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।" যে যুগে এই শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হচ্ছিল এবং সেই সময় যখন জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, কে ধারণা করতে পেরেছিল যে, জার্মানির এই সদ্যজাত বসতিটিতে আহমদীয়াত পৌঁছে যাবে এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষার অনুসারীগণ এখানেও পৌঁছাবে। আজকে ১৩০ বছর পর এখানে কেবল সেই লোকগুলিই আসে নি বরং তারা নিজেদের মসজিদও নির্মাণ করছে। "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব" - হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহর এই যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেটি পূর্ণতা লাভ করার এটিও একটি নিদর্শন।

মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি?

মসজিদ নির্মাণের মূখ্য উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'লার ইবাদত করা এবং সেই খোদার সামনে বিনত হওয়া যিনি সকলের খোদা। আল্লাহ তা'লা কেবল মুসলমানদের আল্লাহ নন। তিনিও ইহুদীদেরও আল্লাহ, খ্রীষ্টানদেরও আল্লাহ এবং হিন্দুদেরও আল্লাহ। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীবাসীকে অবগত করা যে, তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল সেই আল্লাহর ইবাদত করা যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীর অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আমাদেরকে প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে হল, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির সেবা করা। এটিই হল ইসলামী শিক্ষার সারকথা। প্রথমতঃ খোদার ইবাদত করা এবং আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির সেবা করা, তাদের অধিকার প্রদান করা। ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে, চ্যারিটির অর্থ যে এখানে ব্যয় করা হয়েছে এটি কোন অনুগ্রহ নয় বরং এটি এখানকার মানুষের অধিকার যা আমরা প্রদান করা চেষ্টা করে থাকি।

মেয়র সাহেব এবং এখানকার মানুষদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। মেয়র সাহেব আশঙ্কার বিষয়ে বলছিলেন। এটা ঠিক যে, যদি কোন বিষয় সম্পর্কে জানা না থাকে তবে অনেক সময় আশঙ্কা প্রকাশ পায়। এই আশঙ্কার কারণে এখানকার মানুষ বিরোধীতাও করেছে। কিন্তু সেই বিরোধীতা ক্রমেই দূরীভুত হয়েছে অথবা অধিকাংশ মানুষ সেই বিরোধীতাকে গ্রাহ্য করে নি, বরং মানুষের সঙ্গে জামাতের সুসম্পর্ক, সদাচার এবং একাত্মতাকে সামনে রেখে কাউন্সিল এবং অন্যান্য মানুষেরাও এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত যাদের মনে আশঙ্কা রয়েছে ক্রমশঃ তা দূর হয়ে যাবে। বিশেষ করে যখন মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তারা জেনে যাবে যে, মসজিদ তৈরী হওয়াতে কোন ক্ষতি হয় নি বরং উপকারই হয়েছে। আহমদীরা এমন একটি জায়গা পেয়েছে যেখান থেকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। এখান থেকে প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণীর প্রসার ঘটবে। অতএব এই দিক থেকেও আমি এদের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেদের নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করেছেন।

আমীর সাহেব এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করেন যে, এটি খুব বড় মসজিদ নয়। আর এর মিনারাগুলি খুব বড় নয়। অতএব লোকেদের এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। মসজিদ নির্মাণের কারণে যদি কোন চিন্তা করার দরকার হয়, তবে কেউ বিশৃঙ্খলা ছড়াতে চাইলে তার জন্য বড় মসজিদের প্রয়োজন পড়ে না বা ছোট মসজিদ হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী একটি ছোট কামরায় বসেও নাশকতার ষড়যন্ত্র রচনা করতে পারে। বড় মসজিদ হওয়া বা না হওয়া তাদের একাজে কোন বিশেষ গুরুত্ব রাখে না। আমার ধারণা মতে যদি এখানে বড় আকারে মসজিদ নির্মাণ হলে ব্যাপকহারে প্রেম,প্রীতি ও ভালবাসার দৃশ্য চোখে পড়ত। এই কারণে আমি আশা করি, আমীর সাহেবের এই মন্তব্যের কারণে আপনাদের মনে এই ধারণার উদ্রেক হয় নি যে ছোট মসজিদ প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার প্রসার ঘটায় আর বড় মসজিদ অরাজকতার মূল। জামাতে আহমদীয়ার মসজিদ যত বড় হবে তদনুরূপ মানুষের কাছে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার বাণী আমাদের পক্ষ থেকে পৌঁছাবে।

মেয়র সাহেব নিজের কিছু অভিমত ব্যক্ত করেন। মানুষ হওয়ার সুবাদে আমরা নিশ্চয় সকলে এক ও অভিন্ন। ইসলামও এই শিক্ষাই দেয়। তিনি উদারভাবে বলেন যে, সমস্ত ধর্মের অধিকার আছে। ইসলামও এই শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীর নিজস্ব অধিকার আছে এবং ধর্মের সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে। কাউকে জোরপূর্বক কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না এবং কাউকে জোরপূর্বক কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাধা দেওয়া যায় না। কুরআন করীম ঘোষণা দিয়েছে যে, ধর্মের বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ নেই। এটি কুরআন করীমের একটি অত্যন্ত স্পষ্ট আদেশ। অতএব যখন বল প্রয়োগ নেই সেখানে যদি কোন মুসলমান অ-মুসলিমদের ক্ষতি করার কথা বলে তবে তা কুরআন করীমের শিক্ষার পরিপন্থী। বরং কুরআন করীম এতদূর পর্যন্ত ঘোষণা দেয় যে, যদি কেউ মুসলমান হওয়ার পর ইসলাম ত্যাগ করে তবে তার জন্য অনুমতি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 14 June, 2018 Issue No.24

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আছে, এক্ষেত্রে কোন বল প্রয়োগ নেই। অতএব ইসলামে ধর্মের মধ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগের কোন স্থান নেই।

অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা যেহেতু এই দেশে একটি জাতি হিসেবে বসবাস করে। তারা সকলে জার্মান জাতি হিসেবে বসবাস করে, তারা বাইরের কোন দেশ থেকে আসুক না কেন এখন তারা জার্মানের নাগরিক। দেশের সেবা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এবং নাগরিকের প্রতি দেশের অধিকার।

জামাত আহমদীয়া ছাড়াও এখানে নবাগতদের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে অন্যান্য মুসলনরাও আসছে। তাদেরকেও আমি একথাই বলব, এই বিষয়টিকে অনুধাবন করুন যে ইসলামের শিক্ষা হল প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা। ইসলামি শিক্ষার দুটি মৌলিক নীতি রয়েছে। এক, আল্লাহ তা'লাকে ভালবাসা এবং তাঁর অধিকার প্রদান করা। দুই, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকে ভালবাসা এবং তার অধিকার প্রদান করা।

যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অনেক শরণার্থী আসছে। আমি জানি না যে তারা এই শহরে আসছে না কি অন্যত্র, কিন্তু যাইহোক এদেশে অনেকে আসছে। যেহেতু এখানকার প্রশাসন বা এই শহরের বাসিন্দারা শরণার্থীদেরকে এখানে বসবাস করার জায়গা দিয়েছে, তাই এই সকল শরণার্থীদের উচিত এই উত্তম নৈতিক আচরণের প্রতিদান তদনুরূপই প্রদান করা। ভালবাসার প্রতিদান ভালবাসার মাধ্যমে দিন, এবং নিজেদেরকে এই দেশের অভিন্ন অংশ পরিণত করার চেষ্টা করুন।

প্রাক্তন মেয়র সাহেব যিনি পরে অনুষ্ঠানে আসেন, তিনি বলেন আমি রাজনীতিতে সক্রিয় নই, এই কারণে আমি বক্তব্য রাখতে অসম্মতি জানিয়েছিলাম।

আমি মানবিকতার কারণে এখানে এসেছি। মানবতার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হয়ে থাকে। এই কারণে তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। নতুন মেয়র সাহেব বলেন, পূর্বের মেয়রের যুগে অনেক কাজ হয়েছে। আমার ধারণা যদি সঠিক হয় তবে তিনি মেয়র থাকাকালীনই মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা পাওয়া যায়। অতএব তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। আমরা আহমদী হিসেবে তাঁকে এবং এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিককে আশ্বস্ত করতে চাই যে, মসজিদ ইবাদত এবং ধর্মীয় আদেশাবলী পালন করার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। কে কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব আমাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করা উচিত। এখানে বসবাসকারী আহমদীদেরকেও বোঝা উচিত যে, আমাদের প্রত্যেকটি কাজ রাজনীতির ঊর্ধে হওয়া উচিত। পূর্বের মেয়র এখন মেয়র না থাকলেও তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ । তাঁর এই অনুগ্রহকে আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, তাঁর সময়েই আমরা মসজিদের জন্য জমি পেয়েছিলাম। নতুন মেয়রের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি তাঁর পূর্বের মেয়রের কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন। এই সমস্ত কারণে আমরা উভয়ের প্রতিই কৃতজ্ঞ।

প্রাক্তন মেয়র সাহেব বলেন, শহরের বাইরে জমি পাওয়ায় চিন্তার কোন কারণ নেই। আমার কাছে জায়গাটি খুবই দৃষ্টিনন্দন লাগছে। সবুজে ঘেরা একটি মনোরম পরিবেশে আরও একটি সুন্দর অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়াবে যেখান থেকে প্রেম ও প্রীতির বাণী ধ্বনিত হবে। যেখানে আগমণকারীরা ভালবাসা বিনিময় করবে। ফসলের একটি উপকার আছে আবার বাগিচারও উপকার আছে। মসজিদও একটি ফসল এবং এমন একটি স্থান যেখান থেকে এমন সব চারা লালিত পালিত হয় যাতে ভালবাসার ফল ধরে এবং আশপাশের মানুষ সেগুলি থেকে লাভবান হয়। আমি আশা করি এই মসজিদটি তৈরি হওয়ার পর এই জিনিসটি এখানকার মানুষ প্রত্যক্ষ করবেন। ইনশাল্লাহ॥

শহর থেকে দূরত্বের বিষয়টি তেমন পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। আমার স্মরণে আছে, আমাদের ইতিহাসে লেখা আছে যে, মসজিদ ফযল লন্ডনের জন্য যখন জায়গা পাওয়া গেল তখন এটি লন্ডন শহর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত ছিল। জায়গাটি জঙ্গলময় ছিল। সেই সময় সেখানকার যিনি ইমাম এবং আমাদের মুবাল্লিগ ছিলেন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কে পত্রে লেখেন, " সরকার আমাদেরকে মসজিদের জন্য জায়গা দিয়েছে, কিন্তু তা শহর থেকে অনেক দূরে। এখানে কে আসবে? " হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) তাঁকে উত্তরে লেখেন, তুমি চিন্তা করো না। শহর নিজেই এখানে চলে আসবে। আজকে আমরা দেখি যে, লন্ডনের যেস্থানে আমাদের মসজিদটি অবস্থিত সেটি প্রায় প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে শহরের প্রাণকেন্দ্ররূপে বিরাজ করছে। অতএব আমি আশা করি, এই মসজিদটিও শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। ইনশাল্লাহ্ ॥

তিনি আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন, একটি অবধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসীর অর্থ হল সেখানে কেবল বিশৃঙ্খলা ও কলহ বিরাজ করে। এটি একদম সঠিক। নবাগত মুষ্টিমেয় স্বার্থলোভী মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নামের দুর্নাম করেছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আল্লাহ্র উপর কারোর একছত্র অধিকার নেই। আল্লাহ্র নামকে মোনোপোলাইয (এককেন্দ্রীকরণ) করা যায় না। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নাম আছে। আল্লাহ, খোদা, গড, ভগবান ইত্যাদি নাম মানুষ রেখেছে।

কুরআন করীমে প্রথম সূরাতেই আল্লাহ তা'লাকে 'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের প্রভু-প্রতিপালক) বলা হয়েছে। আল্লাহ্ হলেন সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। তিনি ইহুদীদেরও প্রতিপালক ও আল্লাহ। তিনি খ্রীষ্টানদেরও প্রতিপালক ও আল্লাহ। তিনি মুসলমানদেরও প্রতিপালক ও আল্লাহ। তিনি হিন্দুদেরও প্রতিপালক ও আল্লাহ। অতএব আমাদেরকে কুরআন করীমের প্রথম সূরাতেই এই আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, সেই 'রব'-এর প্রতি কৃতজ্ঞ হও যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীর প্রভু-প্রতিপালক। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি এখানে আল্লাহু আকবার ধ্বনি মুখরিত হয় অথবা জামাত আহমদীয়া আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে, তবে একথা মনে করবেন না যে, কোন বিপ্লব সাধনের জন্য বা ভিনধর্মীদেরকে হত্যা করার জন্য এই 'নারা' ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যখন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এই 'নারা' ধ্বনিত হয় তখন এর অর্থ হল তোমরা যেমন আল্লাহ্র অধিকার প্রদান করছ, তদনুরূপ বান্দার অধিকার প্রদানের জন্য পূর্বের চায়তে বেশি নিজেদেরকে পেশ কর। অতএব এটিই হল আমাদের শিক্ষার সারতত্ত্ব এবং এটিই ইসলামী শিক্ষা।

আল্লাহ করুক যেন, এই মসজিদ তৈরী হওয়ার পরও এখানকার আহমদীরা নিজেদের দায়িত্ব সঠিক অর্থে পালন করতে সক্ষম হয় এবং মসজিদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলে। মানুষ যেন দেখতে পায় যে, এখানে আহমদীরা পূর্বেই ভালবাসা প্রকাশ করে এসেছে, এখন এদেরকে মসজিদ দেওয়ার পর এক্ষেত্রে আরও উন্নতি করছে। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। এখন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে এবং সেখানে দোয়া হবে। ইনশাল্লাহ। আস্সালামো আলাইকুম।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.